সাহিত্য-মীমাংসা

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

Bengali Essays

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এরকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি, মানসিক সচেতনতার অভাব বা অন্য যে-কোনো কারণেই হউক, আমরা অনেকেই স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরের অধিকাংশ বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। বিশেষ, যাঁহারা কেবল বাংলা ভাষাই জানেন তাঁহাদের চিত্তানুশীলনের পথে বাধার অন্ত নাই; ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাঁহাদের নিকট রুদ্ধ। আর যাঁহারা ইংরেজি জানেন, স্বভাবতই তাঁহারা ইংরেজি ভাষার দ্বারস্থ হন বলিয়া বাংলা সাহিত্যও সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করিতে পারিতেছে না।

যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কর্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই বিশ্বভারতী এই দায়িত্ব গ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন।

১৩৫০ সাল হইতে এযাবৎ বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের মোট ১২৭ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। পত্র লিখিলে পূর্ণ তালিকা প্রেরিত হইবে।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের পরিপূরক লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার পূর্ণ তালিকা মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। পত্র লিখিলে বিস্তারিত বিবরণ প্রেরিত হইবে।

সাহিত্য-মীমাংসা

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশ ১৩৫৫ শ্রাবণ
দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩৬৭ আশ্বিন : ১৮৮২ শক

মূল্য এক টাকা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী। ৬৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭
মুদ্রাকর শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস। ৫৭ ইন্দ্রবিশ্বাস রোড। কলিকাতা ৩৭

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
মহোদয়ের উদ্দেশে

মুখবন্ধ

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-সমালোচনা ও নন্দন-তত্ত্বের (aesthetics) দিকে আজ বাঙালী মনীষিগণের দৃষ্টি পড়িয়াছে, ইহা খুবই আনন্দের বিষয়। বর্তমান গ্রন্থের কয়েকটি প্রস্তাব বিভিন্ন সাময়িকপত্রে ('দেশ', 'শনিবারের চিঠি') প্রকাশিত হইয়াছিল এবং বিদ্বৎসমাজে সমাদর লাভ করিয়াছিল। প্রাচীন ভারতীয় রসতত্ত্ব কিরূপে ভট্টলোল্লট, ভট্টশঙ্কুক, এবং ভট্টনায়ক প্রমুখ বিশিষ্ট দার্শনিকগণের মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া আচার্য অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদে পরিণতিলাভ করিল, তাহা বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করা এই প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য। রসই যে কাব্যের বা সাহিত্যের আত্মা সে বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বহু মনীষীই একমত। আর সকল উপাদানই বাহ্য। অধ্যাত্মতত্ত্বের মতই যদিও রসতত্ত্ব অনির্বচনীয় ও অনুভবমাত্রগম্য, তবুও উভয় ক্ষেত্রেই ভারতীয় মনীষা কিরূপ সূক্ষ্ম বিবেকদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছে, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়।

বর্তমান প্রবন্ধগুলি ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্র সম্বন্ধে পরিকল্পিত একটি বিস্তৃততর আলোচনার অংশবিশেষ। সহৃদয় পাঠকগণের নিকট ইহা সমাদৃত হইলে, পরিকল্পিত গ্রন্থপ্রকাশনে উৎসাহিত হওয়া যায়—ইহাই আন্তরিক নিবেদন।

অপূর্বং যদ্ বস্তু প্রথয়তি বিনা কারণকলাং
জগদ্ গ্রাবপ্রখ্যং নিজরসভরাৎ সারয়তি চ।
ক্রমাৎ প্রখ্যোপাখ্যাপ্রসরসুভগং ভাসয়তি তৎ
সরস্বত্যাস্তত্ত্বং কবি-সহৃদয়াখ্যং বিজয়তে ॥

—অভিনবগুপ্ত

অর্থাৎ

কোনও কারণব্যতিরেকেই যাহা অপূর্ব বস্তু নির্মাণ করিয়া থাকে,
যাহা নিজের নৈসর্গিক আনন্দাতিশয়ের উল্লাসের দ্বারা
এই পাষাণতুল্য জগৎকে সারবান্ করিয়া তুলে,
এবং যাহা ক্রমে কবির প্রাতিভ দর্শন (intuition)
এবং বর্ণন (expression)-রূপে বিকশিত হইয়া
সেই নীরস বিশ্বকে উদ্ভাসিত করিয়া থাকে
কবি ও সহৃদয়ের চিত্তে স্ফুরণশীল সেই সারস্বত-তত্ত্ব বিজয়লাভ করুক।

গ্রন্থপরিচিতি

শ্রীমান্ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য এম্. এ., পি. আর. এস. বয়সে নবীন হইলেও শাস্ত্রজ্ঞানে ও বিচারশক্তিতে জ্ঞানবৃদ্ধ বলিয়া নিজেকে প্রতিপাদিত করিয়াছেন। শ্রীমানের বহু প্রবন্ধ আজ বিদ্বৎসমাজে সুপরিচিত এবং ইহা আমার উক্তির যথার্থতা প্রমাণিত করিবে।

সম্প্রতি ইনি বাংলা ভাষায় 'সাহিত্য-মীমাংসা' নামে একটি প্রকরণ গ্রন্থ রচনা করিয়া আমাকে ইহার কথামুখ লিখিতে অনুরোধ করেন। গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি বিশেষ ধৈর্য ও মনঃসংযোগের সহিত পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। মনে হইল, একটা প্রয়োজন মিটিবে। আজকাল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত শাস্ত্রসমূহের আলোচনা হইতেছে, ইহা সুখের বিষয়। ইহা একদিকে যেমন জিজ্ঞাসু অধ্যেতৃবর্গের জ্ঞানবর্ধনের হেতু হইবে, সেইরূপ বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধিও করিবে। সে কারণে শ্রীমান্ বিষ্ণুপদের এই গ্রন্থরচনার সার্থকতা আছে। ইহাতে ইচ্ছা বা অনিচ্ছা বা অজ্ঞান বা অল্পজ্ঞান প্রযুক্ত সিদ্ধান্তের বিকৃতি ঘটে নাই। যাহা বুদ্ধি বা মনীষার দ্বারা বুঝা যায় নাই, তাহার কল্পনার সাহায্যে বা কোনও য়ুরোপীয় লেখকের সিদ্ধান্তের অনুরোধে বিকৃতি করা আজকাল প্রচলিত সমুদাচার (fashion) হইয়াছে। এই গ্রন্থে কিন্তু এই নবীন সমুদাচারের অনুবর্তন করা যয় নাই। য়ুরোপীয় মনীষীদের মতের সহিত ইহার কষ্টকল্পনা করিয়া সাজাত্য প্রদর্শনের চেষ্টা করা হয় নাই। যেখানে যেটি সঙ্গত বা সুসদৃশ সেই মতটি উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থে প্রধানতঃ অলঙ্কার শাস্ত্রের মুখ্য প্রমেয় বস্তু রসতত্ত্বের বিচার করা হইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্য-মীমাংসকগণের মতগুলি যথাযথ ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহাই নহে, ইহাদের সারবত্তা ও যুক্তিমত্তাও নূতনভাবে পরীক্ষিত হইয়াছে। প্রতীচ্য মনীষীদের চিন্তার সহিত ইহাদের সামঞ্জস্য যথাসম্ভব

প্রদর্শিত হইয়াছে। বর্তমান যুগের পাশ্চাত্য ভাবধারাবাসিত-চিত্ত পাঠকগণের বুঝিবার সুবিধা ইহাতে হইবে। সুখের বিষয়, তাঁহারা ভুল বুঝিবেন না।

এই গ্রন্থ অধ্যয়নে কেবল সাধারণ শিক্ষিত শ্রেণীই যে উপকৃত হইবেন তাহা নহে, যাঁহারা বিশেষবিদ্ এবং অলঙ্কার শাস্ত্রে কৃতপরিশ্রম, ইহা আলোচনা করিলে তাঁহাদেরও অনেক বিষয়ে জ্ঞান বৈশদ্য লাভ হইবে। এ জাতীয় গ্রন্থের আবশ্যকতা অস্বীকার করা যায় না। পাণ্ডিত্যের অপরিপন্থী অথচ সাধারণের গ্রহণশক্তির যোগ্য করিয়া গ্রন্থ রচনা করা আজ বিশেষভাবে আবশ্যক। বিশ্বভারতীর অধিকারিবর্গ এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন অনেকদিন। তাঁহাদের চেষ্টা অনেকাংশে সাফল্য লাভ করিয়াছে। এই সাফল্য লাভের প্রধান কারণ তাঁহাদের লেখক নির্বাচনের উপর নির্ভর করিতেছে। বর্তমান প্রবন্ধের লেখকনির্বাচন সমীচীন হইয়াছে, ইহা আশা করি আমার মত অনেকেই স্বীকার করিবেন। আমি এই গ্রন্থের পঠন-পাঠনের বহুলপ্রচার কামনা করি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-সাহিত্য-পরীক্ষার্থীদের পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত হইবে, এই আশাও পোষণ করি।

শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায়
অধ্যক্ষ, সংস্কৃত বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সাহিত্য-মীমাংসা

আমাদের বর্তমান আলোচনার নাম সাহিত্য-মীমাংসা—ইংরেজী Literary Criticism শব্দের ইহা হুবহু প্রতিশব্দ। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেরও অগ্রগতি হয়। যে জাতি বর্বরতার স্তর অতিক্রম করিতে পারে নাই তাহার সাহিত্য বলিতে কিছুই নাই। সাহিত্য সভ্যতার প্রতীক, এবং সাহিত্যের উন্নতি ও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যবিচারের ধারাও ক্রমশ সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে। সাহিত্যের স্রষ্টা ও পাঠক, উভয় সম্প্রদায়ের মনেই স্বভাবত এই জিজ্ঞাসার উদয় হয়, সাহিত্য কি? ইহার উদ্দেশ্যই বা কি? সাহিত্য-পাঠের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? কবিমনের উপাদান কি? সাহিত্যের সহিত অন্যান্য শিল্প ও কলা, যেমন চিত্র, ভাস্কর্য, সংগীত, যাহাদের ভিতর দিয়া সভ্য মানব নিজেদের অন্তর্লোকের আনন্দ ও আদর্শ বাহিরের লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রকাশিত করিয়া থাকে, তাহাদের ভেদ কি? এইরূপ শত শত জটিল প্রশ্নের সমাধানই সাহিত্য-মীমাংসা-শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভারতের সভ্যতা বহু প্রাচীন। ইউরোপের বর্তমান সভ্য সমাজ যখন অরণ্যের গহন অন্ধকারে পশুশিকারে ব্যস্ত ছিল, আত্মরক্ষা ও শরীরধারণই ছিল যখন তাহাদের জীবনের প্রধান সমস্যা, তখন আমাদের এই প্রাচীন ভারতবর্ষে সভ্যতার প্লাবন বহিয়াছিল। বিজ্ঞানে চিকিৎসাবিদ্যায় ভাস্কর্যে চিত্রে দর্শনে সাহিত্যে শত ধারায় ভারতীয় সভ্যতা ভারতীয় আদর্শ আপনাকে প্রকাশ করিতেছিল। আজ সে প্লাবন আর নাই, সে সকল ধারা শুষ্ক। কিন্তু তখনকার সাহিত্য ও সাহিত্য-মীমাংসার প্রণালী বহু অপঠিত ও অনাদৃত পুঁথির মধ্যে লুকাইয়া আছে। আমরা তাহাদের কোনও পরিচয়ই রাখি না। ইউরোপের সাহিত্যের উজ্জলতায় আমরা মুগ্ধ, আমরা একান্ত শ্রদ্ধার সহিত গ্রীক্ মনীষী আরিস্ততল্-এর সাহিত্য-বিশ্লেষণ শ্রবণ করিবার জন্য উৎসুক।

কিন্তু আমাদের প্রাচীন ভারতের নমস্য আচার্যগণ সাহিত্যের স্বরূপ-বিশ্লেষণের পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের অলৌকিক প্রজ্ঞাবলে শিল্প ও কলার উৎকর্ষ ও অপকর্ষ নির্ধারণের যে সকল মানদণ্ড নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের বর্তমান শিল্প ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে কতদূর প্রযোজ্য, এই সমস্ত বিষয়ে আমাদের কোনও অনুসন্ধিৎসাই নাই।

অনেকে বলিবেন, সংস্কৃতে সাহিত্য সম্বন্ধে যে বিচারপদ্ধতি তাহা যে বর্তমানের লৌকিক সাহিত্যক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হইবে, ইহা ধারণা করা অন্যায়। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ যে দৃষ্টিতে সাহিত্যের বিচার করতেন, আমাদের বিচার করিবার দৃষ্টি তাহা হইতে বিভিন্ন ও নূতন। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে বর্তমান সাহিত্যের ন্যায় জটিলতা ছিল না। তখন Realism এবং Idealism লইয়া কবি ও সমালোচকগণের মধ্যে কলহের সূত্রপাত হয় নাই। আধুনিক ভাষার ন্যায় উপন্যাস-সাহিত্য বলিয়া কোনও বিভাগ সংস্কৃত ভাষায় ছিল না। অভিনয় ও নাট্য তখনকার দিনে মানবজীবনের সহিত এত ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া উঠে নাই। পৌরাণিক ঘটনাই ছিল কাব্য ও নাট্যের প্রধান অবলম্বন। মহাভারত-রামায়ণের ন্যায় মহাকাব্য, কালিদাসের কুমারসম্ভব রঘুবংশ, মাঘের শিশুপালবধ, ভারবির কিরাতার্জুনীয়—ইহাদের আদর্শে রচিত কতকগুলি কাব্য, মেঘদূতের ন্যায় কতকগুলি খণ্ডকাব্য, অভিজ্ঞানশকুন্তল উত্তররামচরিত প্রভৃতির অনুকরণে রচিত কতকগুলি পৌরাণিক নাটক, হাল্‌কা, নিতান্ত স্থূল ধরণের কতকগুলি প্রহসন, বাণভট্টের হর্ষচরিত ও কাদম্বরীর ছাঁচে ঢালা কয়েকখানি গদ্যকাব্যই ছিল সাহিত্য-সমালোচকের সমালোচনার যথাসর্বস্ব পুঁজি—stock-in-trade। আজকাল আধুনিক সাহিত্যে সমালোচনার ক্ষেত্র বহুদিকে প্রসারিত হইয়াছে, সাহিত্যের জটিলতা বাড়িয়াছে, কবিত্বশক্তির ক্রমাভিব্যক্তি ঘটিয়াছে, মানবজীবন ও সাহিত্যের মধ্যে সুগভীর সম্বন্ধ কবি ও সমালোচকগণ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। আজ আর পৌরাণিক প্রেমকাহিনী, বীরত্বের কথা পাঠক ও দর্শকের হৃদয়

আকর্ষণ করিতে পারে না। তাহারা নিজেদের জীবনেরই প্রতিচ্ছবি সাহিত্যের মধ্যে নূতন বর্ণে অঙ্কিত দেখিবার জন্য উৎসুক। অতএব সাহিত্যের আদর্শ প্রাচীন যুগ হইতে বর্তমান যুগে বহু পরিবর্তিত হইয়াছে। সুতরাং মৃত, প্রস্তরীভূত, নির্জীব সাহিত্যের সমালোচনার মানদণ্ড লইয়া সজীব এবং ক্রমবর্ধমান সাহিত্যের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বিচার করিতে বাসলে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে।

অপর পক্ষে, ইউরোপীয় সাহিত্য-মীমাংসার ধারা সাহিত্যসৃষ্টির সহিত সমান বেগে প্রবাহিত হইয়াছে, দুয়ের মধ্যে কোনও ব্যবধান রচিত হয় নাই। ইউরোপীয় মনীষিগণ কখনও অন্ধভাবে অতীতের পূজা করেন নাই। যুগে যুগে বিখ্যাত সমালোচকগণ সমসাময়িক সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের নিজ নিজ বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী স্বতন্ত্রভাবে, স্বাধীন চিন্তাশক্তির বশবর্তী হইয়া সাহিত্যের মাপকাঠি নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। পরববর্তী যুগে, আবার নূতন যুগ-সাহিত্যের প্রবাহে তাঁহাদের সেই তুলাদণ্ড হয়তো ভাসিয়া গিয়াছে। আবার তাৎকালিক সমালোচকগণ নূতন বিচার-পদ্ধতি প্রবর্তিত করিয়াছেন। এইভাবে সাহিত্যের সহিত সমালোচনারও ক্রমাভিব্যক্তি ঘটিয়াছে, তাহাতে নবীনতা আছে, নূতন ভাব-ধারার সহিত সংমিশ্রণে তাহা প্রবহমান নদীর মত সজীব। সত্য বটে, ইউরোপীয় সমালোচনা-সাহিত্যও আরিস্তত্‌ল্‌-এর কাব্য-মীমাংসা বিষয়ক চিরন্তন গ্রন্থের (*Poetics*) উপরই মুখ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু তাহা হইলেও আরিস্তত্‌ল্‌-এর মূল সূত্রগুলির যুগোপযোগী ব্যাখ্যার দ্বারা ইউরোপীয় মনীষিবৃন্দ তাহাকে বর্তমান সাহিত্যের সহিত সংযুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এইভাবে তাঁহারা অতীতের সহিত বর্তমানের সংমিশ্রণ ঘটাইয়াছেন। বিচ্ছিন্ন অপরিচিত নির্জীব অতীতের দ্বারা সজীব বর্তমানের যাচাই করিবার প্রয়াস করেন নাই। কিন্তু এই যুক্তির দ্বারা ভারতীয় নিজস্ব সাহিত্য-সমালোচনা-রীতি ও প্রাচীন শাস্ত্রধারার প্রতি আমাদের বিতৃষ্ণা সমর্থন করা যায় না। আমাদেরও আরিস্তত্‌ল্‌ স্থানীয় বহু মনীষী রহিয়াছেন, তাঁহাদের রচিত

সাহিত্য-মীমাংসা-বিষয়ক একাধিক গ্রন্থও আজ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এক-একখানি পুস্তক অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার। ইউরোপীয় সাহিত্যিক ও সমালোচকবৃন্দ যেমনভাবে আরিস্ততল্ হোরেস্ প্রভৃতি প্রাচীন মনীষিগণের সাহিত্য-মীমাংসা-বিষয়ক গ্রন্থসমূহ পাঠ করিয়া সমসাময়িক সাহিত্যধারার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য নূতন দৃষ্টিতে তাহাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং করিতেছেন, কই, সেইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তো আমরা আমাদের স্বদেশের শাস্ত্রের পঠন-পাঠন করিতেছি না? অথচ বিদেশীয় শাস্ত্রের প্রশংসায় আমরা পঞ্চমুখ। বের্গ্সঁ-এর Creative Evolution-এর কথা উঠিলে আমাদের রসনা আর যেন বিশ্রান্ত হইতে চাহে না, অথচ আমাদের প্রত্যেকেই মৃত, আমাদের সৃজনী-শক্তিও নাই, অভিব্যক্তিও নাই। সমস্ত দোষ প্রাচীনদের উপর চাপাইয়া আমরা সকল ভার হইতে যেন অব্যাহতি লাভ করিতে পারিলেই বাঁচি। প্রতীচীর বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় রঞ্জিত চক্রবালের দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ। ইউরোপের প্লেটো আছেন, আরিস্ততল্ আছেন, হোরেস্ আছেন; আমাদের ভরত নাই, ভামহ নাই, দণ্ডী নাই, অভিনবগুপ্ত নাই? আজ প্রতীচ্য হইতে প্রাচ্যের আকাশের প্রতি দৃষ্টি ফিরাইতে হইবে। অতীতের গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে যে সকল রত্ন অনাদৃত অবহেলিতভাবে লুকাইয়া আছে, আজ আবার তাহাদের নূতন করিয়া ফিরিয়া পাইতে হইবে, তাহাদের নূতন করিয়া সংস্কার করিতে হইবে। তখন দেখিতে পাইব, আমাদের প্রাচীন আচার্যগণ সাহিত্যের যে স্বরূপ নির্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন, সাহিত্যের যে উদ্দেশ্য তাঁহারা ঘোষণা করিয়া গিয়াছিলেন, এক কথায় যে ভাবে তাঁহারা সাহিত্যের বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা কোনও নির্দিষ্ট কালের বা দেশের পরিধির মধ্যে আবদ্ধ নহে, তাহা সর্বকালের সর্বদেশের সাহিত্যের গুণাগুণ নিরূপণ করিবার শাশ্বত মানদণ্ডস্বরূপ। তাঁহারা জানিতেন, যুগে যুগে সাহিত্যের গতিপথ বিভিন্ন দিকে, বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়, রচনার শৈলী পরিবর্তিত হয়, সাহিত্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ বিষয়ে কবি ও সহৃদয় উভয়েরই

ধারণার অভিব্যক্তি ঘটে। সংস্কৃত অলংকার-সাহিত্যের ধারা যাঁহারা নিপুণভাবে সমীক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এ কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। নাট্যশাস্ত্রের প্রবক্তা আচার্য ভরত হইতে আরম্ভ করিয়া একাদশ শতকের শেষভাগে মম্মটাচার্য পর্যন্ত বিস্তৃত এই দীর্ঘ সাহিত্য-মীমাংসক-সম্প্রদায় কেবল পুরাতনেরই চর্চা করিয়া গিয়াছেন, এইরূপ কথা অনভিজ্ঞ সংস্কৃত-বিদ্বেষীর মুখেই কেবল শোভা পায়। নূতন নূতন অলংকারগ্রন্থে নূতন নূতন প্রশ্নের উত্থাপন হইতেছে। ভরত যাহা জানিতেন না, ভামহ দণ্ডী উদ্ভট প্রভৃতি আচার্য তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহার সমাধান দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রাচীনের দৃষ্টিতে যেখানে শব্দ অর্থ ও অলংকার ভিন্ন সাহিত্যের অন্য কোনও উপাদান ধরা পড়ে নাই, নবীন সাহিত্য-মীমাংসকগণ সেখানে সাহিত্যের আত্মার অনুসন্ধানে ব্যস্ত, বাহিরের আবরণ ভেদ করিয়া অন্তরের তত্ত্ব সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহারা ব্যাপৃত। প্রাচীনেরা যখন গুণ ও অলংকারের মধ্যে কোনও ভেদ লক্ষ্য করিতে পারেন নাই, নবীন আলংকারিক সেখানে উভয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম ভেদ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। আজকাল যেমন সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তুমুল বিবাদ উঠিয়াছে, তাহার সমাধানের কোনও কিনারা পাওয়া যাইতেছে না, আমাদের প্রাচীন আচার্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই জটিল সমস্যা লইয়া দীর্ঘ বিতণ্ডা চলিয়াছিল, এবং তাঁহারা উহার যে সমাধান নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, আজও আমরা আমাদের মনোবিজ্ঞান-শাস্ত্রের নবলব্ধ সমীক্ষা-প্রণালী ও বিশ্লেষণনৈপুণ্য সত্ত্বেও তাহা অপেক্ষা অধিকতর সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিয়াছি বলিয়া বিশ্বাস হয় না। কেবল, ভারতের অতীত আলংকারিক সম্প্রদায় ও বর্তমানের ইউরোপীয় সমালোচক সম্প্রদায়ের মধ্যে তফাত এইটুকু মাত্র যে, আমাদের প্রাচীন আচার্যগণ যেখানে অতি অল্প কথায়, সংযতভাবে সাহিত্যবিষয়ক দুরূহ সমস্যাসমূহের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাদের শেষ উত্তর দিয়াছেন, আধুনিক সমালোচকগণ সেখানে বিস্তৃত মনোবিশ্লেষণের অবতারণা করিয়া সমস্যাগুলিকে আরও দুর্বোধ্য করিয়া

তুলিয়াছেন, শুধু নিজেদের পাণ্ডিত্য ও বাক্‌চাতুর্যের পরিচয় দিবার ছলে। ইহার কারণ আছে। আমাদের শাস্ত্রধারার বৈশিষ্ট্য এই যে, শাস্ত্রকারগণ তাঁহাদের প্রতিটি উক্তি উপযুক্ত যুক্তির দ্বারা, হেতুর দ্বারা, দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের দ্বারা সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা জানিতেন যে, হেতুশূন্য অযৌক্তিক কোনও সিদ্ধান্তই প্রতিবাদিগণ গ্রহণ করিবেন না, হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। "একাকিনী প্রতিজ্ঞা হি প্রতিজ্ঞাতং ন সাধয়েৎ।" তাঁহাদের আলোচনার এই অত্যধিক যুক্তিমূলকতার কারণ ন্যায়শাস্ত্রের—আমরা যাহাকে Logic বলি—অত্যধিক পঠনপাঠন। আন্বীক্ষিকী বা ন্যায়শাস্ত্র সমস্ত শাস্ত্রচর্চার প্রদীপস্বরূপ—"প্রদীপঃ সর্বশাস্ত্রাণাম্ উপায়ঃ সর্বকর্মণাম্।" ন্যায়শাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুযায়ী চিন্তা করিবার রীতি, শাস্ত্রবিচার করিবার প্রণালী আমাদের পূর্বাচার্যগণের স্বভাবসিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। দুরূহ দার্শনিক বিচারে যেমন ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োগ ছিল, উপযোগিতা ছিল, সাহিত্য-মীমাংসা বিষয়েও তাহার প্রয়োগ ও উপযোগিতা কিছুমাত্র কম নয়। বর্তমানের ন্যায় Logic-এর চর্চা তাঁহাদের নিকট ব্যবহারজীবনের সহিত সম্পর্কশূন্য, কেবলমাত্র প্রয়োগহীন academic studyতে পর্যবসিত হয় নাই। তাঁহাদের চিন্তাধারার সহিত উহা অঙ্গাঙ্গিভাবে অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত ছিল। কিন্তু আমাদের নিকট এই অত্যধিক যুক্তিনির্ভরতা, আন্বীক্ষিকীপ্রিয়তা—logicophilia, অসহ্য। বর্তমানের ইউরোপীয় মনীষিগণও আরিস্ততল্-এর Syllogism অনুযায়ী বিচার করিতে বসেন না।[১] আমাদের কাছে যুক্তি অপেক্ষা ভাবোচ্ছ্বাসই অধিকতর প্রিয়। তাহার মধ্যে অনেক বাষ্প আছে, কিন্তু উত্তাপ নাই; উন্মাদনা আছে, কিন্তু প্রেরণা নাই। সুতরাং আমরা যে প্রাচীন ভারতীয়

---

১. "...It seems to me that one of the reasons why our people are alive and flourishing, and have avoided many of the troubles that have fallen to less happy nations, is *because we have never been guided by Logic in anything we have done.*"—Baldwin : Prof. L. Susan Stebbing প্রণীত '*Thinking to Some Purpose*' গ্রন্থে উদ্ধৃত। পৃ. ১১—Pelican Books

আচার্যগণের যুক্তিপূর্ণ গ্রন্থসমূহ ত্যাগ করিয়া বর্তমান ইউরোপের সমালোচকগণের উচ্ছ্বাসময় সাহিত্য-মীমাংসা-বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকিব, ইহাতে বৈচিত্র্য কি ?

আমরা অবাক হইয়া ভাবি, সাহিত্য-মীমাংসার গ্রন্থে এত অনুমান, এত সূক্ষ্ম তর্ক কিসের, এত চুলচেরা বিচারের কিসে প্রয়োজন ? এত ঘটত্বাৎ পটত্বাৎ -এর সমাবেশ কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ? কিন্তু এই বিস্ময়ের মূলে আছে সাহিত্য-মীমাংসার মুখ্য উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্ত ধারণা। সাহিত্য-মীমাংসা কেবল পাঠকের বা দর্শকের হৃদয়ের বস্তুশূন্য ভাবোচ্ছ্বাস নহে—যদি তাহাই হইত, তবে তাহা সাহিত্য-মীমাংসা না হইয়া সাহিত্যের মধ্যেই গণিত হইত। এবং বর্তমানের অধিকাংশ তথাকথিত সাহিত্য-মীমাংসা-বিষয়ক গ্রন্থ সাহিত্যেরই স্বতন্ত্র শ্রেণীরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। বস্তুত সাহিত্য-মীমাংসা একটি স্বতন্ত্র দর্শন-বিশেষ। বন্ধনকাতর স্বাধীন কবিপ্রতিভা যেমন সাহিত্যসৃষ্টির অনুকূল, সেইরূপ যথার্থ সাহিত্য-মীমাংসক যিনি, তাঁহার প্রতিভা অপেক্ষা বিচারবুদ্ধি (reason), কল্পনা অপেক্ষা তত্ত্বদৃষ্টি, বাস্তবজগতের প্রতি অসহিষ্ণুতা অপেক্ষা বস্তুপরতন্ত্রতারই অধিকতর প্রয়োজন। কবিকল্পনা যতই শৃঙ্খলহীন বলিয়া আপাতত প্রতিভাত হউক-না কেন, তাহার মধ্যেও একটি অনুল্লঙ্ঘনীয় নীতি আছে, কার্যকারণ-ভাব আছে। সহৃদয় পাঠকের সৌন্দর্য ও রসবোধ যতই স্ব স্ব অসাধারণ ব্যক্তিত্বের ও আন্তরিকতার উপর নির্ভর করুক-না কেন, তাহার মধ্যেও একটি সুনির্দিষ্ট শৃঙ্খলা নিহিত আছে। যিনি প্রকৃত সাহিত্য-সমালোচক, তিনি কবির সাহিত্যসৃষ্টি এবং সহৃদয়ের রসোদ্বোধ এই উভয়ের অন্তর্নিহিত সাধারণ কার্যকারণতত্ত্ব ও শৃঙ্খলা—যাহা প্রাকৃতজনের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না—তাহারই বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করেন। ইহাকে দর্শন ছাড়া আর কি বলিতে পারা যায় ?[১] এবং ইহা তো সর্ববাদিসম্মত সত্য

---

১. "True criticism of art is certainly *aesthetic* criticism, but not because it disdains philosophy, like pseudo-aesthetic, but because it acts as philosophy

যে ভাবোচ্ছাস দার্শনিকতার পরিপন্থী। দার্শনিক তত্ত্বের মূল ভিত্তি স্থির অকম্পনীয় বিচারবুদ্ধি ও সুনিপুণ পদার্থ বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, আমাদের প্রাচীন ভারতের যাঁহারা সাহিত্য-মীমাংসার বিভিন্ন প্রস্থানের পরামাচার্য—তাঁহারা সকলেই বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্রে অধিগতবিদ্য ছিলেন। ধ্বনিবাদের প্রবর্তক আচার্য আনন্দবর্ধন বেদান্ত ও বৌদ্ধদর্শনে পারঙ্গম ছিলেন। এই উভয় দর্শনের উপরেই তিনি একাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের টীকাকার ভট্টনায়ক একজন শ্রেষ্ঠ মীমাংসক ছিলেন। আচার্য অভিনবগুপ্ত, যাঁহার ধ্বন্যালোকলোচন এবং অভিনবভারতী সাহিত্য-মীমাংসার রত্নভাণ্ডার-বিশেষ, তিনিও একজন প্রধান দার্শনিক বলিয়াই খ্যাত, কাশ্মীরীয় প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শনের তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য। এইরূপে যদি আমরা অনুসন্ধান করি, তবে দেখিতে পাইব যে, যাঁহারা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-মীমাংসক বলিয়া পরিচিত তাঁহারা শ্রেষ্ঠ দার্শনিকও বটে। শুধু আমাদের প্রাচীন ভারতেই নয়—প্রাচীন ইউরোপ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান ইউরোপের সাহিত্য-মীমাংসার ধারা পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাইব—যিনিই শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, তিনিই প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সমালোচক। আরিস্তত্‌ল্-এর দার্শনিকতার কথা কে না জানেন? বর্তমান ইউরোপের যাঁহারা মূর্ধাভিষিক্ত সাহিত্য-সমালোচক, তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রখ্যাতনামা দার্শনিক। ইংলণ্ডের

---

and as conception of art..." —Benedetto Croce: *The Essence of Aesthetic*, p. 101. London, William Heinemann, 1921

পুনশ্চ—"...as we observe with the truly great critics, and above all with De Sanctis, in his "History of Italian Literature" and in his "Critical Essays", where he is as profound a critic of art as of philosophy, morality and politics; he is profound in the one because profound in the other, and inversely: the strength of his pure aesthetic consideration of art is the strength of his pure moral consideration of morality, of his pure logical consideration of philosophy, and so on,"—ঐ. পৃ. ১০৩।

Coleridge, Bradley, ইটালির Benedetto Croce, রুশিয়ার Tolstoy, ফ্রান্সের Henri Bergson, জার্মানির Kant, Hegel, Herder, Schopenhauer, ইঁহাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দার্শনিক মতবাদের উপর ভিত্তি করিয়া, বৃহত্তর মানবজীবন ও বিশ্বসৃষ্টির চরম এবং পরম লক্ষ্য ও পরিণতি সম্বন্ধে ব্যক্তিগত ধারণার দ্বারা পরিচালিত হইয়া সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করিবার জন্য প্রযত্নবান্ হইয়াছেন। যাঁহারা বৌদ্ধ শূন্যবাদিদের ন্যায় সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে অজ্ঞেয়তাবাদী (Agnostic) তাঁহাদের মতে সাহিত্যের লক্ষণ, রসাস্বাদের লক্ষণ, কোনও কিছুরই যথার্থ লক্ষণ অসম্ভব। কেন না, তাঁহাদের দার্শনিক মতবাদ অনুযায়ী ভাষার দ্বারা এই বিশ্বের কোনও বস্তুরই, অতি ক্ষুদ্রতম তুচ্ছতম বস্তুরও, যাহাকে আমরা একান্ত পরিচিত বলিয়া মনে করিতেছি, তাহারও প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা করা অসম্ভব। সুতরাং কি করিয়া সাহিত্যের লক্ষণ ভাষায় প্রকাশ করিব, কি করিয়াই বা সাহিত্যপাঠের আনন্দ ও রসানুভূতির স্বরূপ ভাষার ভিতর দিয়া বর্ণনা করিব? অতএব কবি সাহিত্যসৃষ্টি করিতে থাকুন, আমরা আনন্দলাভ করি, ইহাই যথেষ্ট। তাহার কার্যকারণতত্ত্ব জানিয়া কি ফল, যখন জানিলেও ভাষায় তাহা প্রকাশ করিবার কোনও উপায়ই নাই? সুতরাং—'মূকতৈব বরম্'। আমরা যখন সাহিত্যে রসাভিব্যক্তি বিষয়ে আলোচনা করিব তখন দেখিতে পাইব যে, বিভিন্ন প্রস্থানের দার্শনিকগণ কি ভাবে স্ব স্ব সিদ্ধান্তানুসারে রসের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। নৈয়ায়িক, মীমাংসক, বৈদান্তিক, শৈব প্রত্যাভিজ্ঞাবাদী প্রত্যেকেরই মতবাদ পরস্পর-বিভিন্ন। বের্গ্সঁ তাঁহার *Laughter* শীর্ষক চিন্তাপূর্ণ পুস্তকে সাহিত্যে হাস্যরসের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া স্বকীয় দার্শনিক মতবাদ— creative evolution—জীবনতত্ত্বের ক্রমবিবর্তনবাদকেই মূল ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়ছেন।[১]

১. দ্র° "...An idea is something that grows, buds, blossoms and ripens from the beginning to the end of a speech. It never halts, never repeats itself.

ভারতীয় ও ইউরোপীয় সাহিত্য-সমালোচকগণের দার্শনিকতার ক্ষেত্রে এই ঘনিষ্ঠ সাম্য কেবলমাত্র আকস্মিক ঘটনাবিশেষ বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। অপর পক্ষে, সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে ইহাই স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইবে। সাহিত্য জীবনের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান—ইহা প্রত্যেকেই স্বীকার করিবেন। সাহিত্য মানবজীবনেরই প্রতিকৃতি মাত্র, যদিও কবিকল্পনা তাহাকে নানাবর্ণে রঞ্জিত করিয়া সহৃদয় পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করে। সুতরাং মানবজীবন সম্বন্ধে যাঁহার অন্তদৃ´ষ্টি যত গভীর, তাহার উদ্দেশ্য ও পরিণতি সম্বন্ধে যাঁহার অনুভূতি যত সুস্পষ্ট—সাহিত্যের উদ্দেশ্য, স্বরূপ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার অভিমত তত গম্ভীর ও তথ্যপূর্ণ হইবে, ইহা বিচিত্র কি? এবং এ কথা কোন্ ব্যক্তি অস্বীকার করিবে যে, মানবজীবনের গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে দার্শনিক মনীষিগণের অন্তর্দৃষ্টি সর্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ? কিন্তু অধুনাতন সাহিত্য-সমালোচকগণের ক্ষেত্রে এই দার্শনিক তথ্যানুসন্ধিৎসা অপেক্ষা স্বতন্ত্র ভাবুকতারই অধিক প্রাধান্য।

It must be changing every moment, for to cease to change would be to cease to live. Then let gesture display a like animation! Let it accept the fundamental law of life, which is the complete negation of repetition! But I find that certain movement of hand or arm, a movement always the same, seems to return at regular intervals. If I notice it and it succeeds in diverting my attention, if I wait for it to occur and it occurs when I expect it, then involuntarily I laugh. Why? Because I now have before me a machine that works automatically. This is no longer life, it is automaton established in life and imitating it. It belongs to the comic"—*Laughter*: pp. 31-32 Macmillan and Co. Ltd. 1935

পুনশ্চ—"A continual change of aspect, the irreversibility of the order of phenomena, the perfect individuality of a perfectly self-contained series. Such, then, are the outward characteristics...—which distinguish the living from the merely mechanical. Let us take the counterpart of each of these: we shall obtain three processes which might be called *repetition*, *inversion*, and *reciprocal interference of series*. Now, it is easy to see that these are also the methods of light comedy, and that no others are possible."—ঐ, পৃ ৮৯।

বর্তমানের সমালোচনার ধারা সাহিত্যের সর্বজনীনতা অপেক্ষা বিশিষ্ট কবি-মানসের ইতিহাস ও অভিব্যক্তি লইয়াই বেশি ব্যস্ত। সাহিত্যের— দেশকাল-নির্বিশেষে— যথার্থ কি স্বরূপ হওয়া উচিত, সাহিত্যের সার্বজনীন ও সার্বকালিক উদ্দেশ্য ও লক্ষণ কি, সাহিত্যে সৌন্দর্য ও রসোদ্বোধের উপাদান— এই সকল বিষয় অপেক্ষা সাধারণ সমালোচক ও পাঠক বিশেষ বিশেষ কবির সাহিত্যের বিশ্লেষণ ও উপলব্ধিতেই যেন অধিকতর আনন্দ লাভ করে। জগতের প্রধান প্রধান সাহিত্যের সাধারণ লক্ষণ কি, তাহাদের মধ্যে লক্ষণীয় সাম্য কোন্ কোন্ বিষয়ে—ইহা জানিবার জন্য সাধারণত ততখানি উৎসাহ ও ঔৎসুক্য নাই। তাহা অপেক্ষা—শেক্সপীয়র-এর বিশিষ্ট নাট্য-প্রতিভার উন্মেষের ইতিহাস আলোচনায়, তাহার ক্রমবিকাশ ও উৎকর্ষ বিশ্লেষণেই আমাদের উৎসাহ সমধিক। বাংলা সাহিত্যের—বাংলা ভাষার সহিত প্রকৃত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, কিরূপ লক্ষণ, রচনার কি প্রকার শৈলী, যুগধর্মের অনুযায়ী কিরূপ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন—এদিকে আমাদের তত ঔৎসুক্য নাই, যতখানি মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণের কাব্যপ্রতিভার ঐতিহাসিকতা জানিবার জন্য আছে।

মোট কথা, সর্বজনীনতা বা বিশ্বজনীনতার দিক হইতে আমরা আমাদের সমালোচনার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়াছি—আমাদের দৃষ্টি এখন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের উপর নিবদ্ধ। বিশিষ্ট বনস্পতির উচ্চতাই আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে, অরণ্যের সমগ্র শোভা ও বিশালতা আমাদের দৃষ্টিতে পড়িতেছে না। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-মীমাংসা-বিষয়ক গ্রন্থসমূহ পাঠ করিলে আমাদের পর্যবেক্ষণ-শক্তির এই সংকীর্ণতা, আধুনিক সমালোচনাপদ্ধতির এই ক্রমবর্ধমান ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা অনেকটা দূর হইবে। সাহিত্যের বিশ্বজনীন স্বরূপ ও আদর্শ বিশ্লেষণই ভারতীয় সাহিত্য-মীমাংসা-শাস্ত্রের প্রধানতম লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্য। সত্য বটে, সংস্কৃত কাব্য, সংস্কৃত নাটক প্রভৃতিই প্রাচীন

ভারতীয় সাহিত্য-মীমংসার মুখ্য উদাহরণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে; কিন্তু তাঁহাদের যে সকল নির্দেশ, তাহা যে কোনও সাহিত্যে সমানভাবে প্রযোজ্য। সংস্কৃত উদাহরণ কেবলমাত্র আকস্মিক। উহার স্থলে জগতের যে কোনও সাহিত্যের কাব্য ও নাট্যগ্রন্থ হইতে উদাহরণ দেখাইলেও কোনও ক্ষতি হইত না। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের মুল অনুশাসনগুলি যে কেবল ভারতীয় সংস্কৃত নাটকের ক্ষেত্রেই উপযোগী তাহা নহে, যে কোনও সভ্যজাতির নাট্যসাহিত্যের গঠনপ্রণালী (architectonics) বিচার করিতে হইলে তাহাদের উপযোগিতা কিছুমাত্র কম বলিয়া বোধ হইবে না। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর ইহাই প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাহার দর্শনে শিল্পে সাহিত্যে এই বিশ্বমানবতা সমানভাবে লক্ষণীয়। প্রাচীন ভারতীয় মন ক্ষুদ্র দেশের এবং কালের গণ্ডিকে উপেক্ষা করিয়া তাহার বহু উর্ধ্বে উঠিতে শিখিয়াছিল, যেখান হইতে নিম্নের সমস্ত সীমা ও ব্যবধান মিলাইয়া যাইত এক অসীম সমগ্রতার মধ্যে। আজিকার দিনে ভারতীয় সমালোচনা-সাহিত্যের অনুশীলনের ইহাই সর্বপ্রধান প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়। আধুনিক ইউরোপীয় বিচারভঙ্গীর সহিত প্রাচীন ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সংমিশ্রণ ঘটাইতে হইবে; ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সমষ্টিগত সমগ্রতার উপলব্ধি করিতে হইবে; জাতীয়তা ও যুগধর্মের সহিত সর্বজনীন ও সার্বকালিক সত্য—সাহিত্যের মধ্য দিয়া যাহার বাহ্য প্রকাশ, তাহাকে সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করিতে হইবে। তবেই সাহিত্য-মীমাংসার যথার্থ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে—ইহাই বিশ্বাস।

সাহিত্যের লক্ষণ কি। এ সম্বন্ধে আচার্যগণের মধ্যে নানা প্রকার মতভেদ লক্ষিত হয়। কেবলমাত্র শব্দই কি সাহিত্য অথবা কেবলমাত্র অর্থ, কিংবা শব্দ ও অর্থের পরস্পর সংহতি? এখানে বলা বাহুল্য যে, যখন শব্দ ও অর্থকে স্বতন্ত্রভাবে 'সাহিত্য' বলিয়া গণনা করা হয়, তখন তাহাদের প্রাধান্যই মুখ্যভাবে অভিপ্রেত। কেবলমাত্র শব্দকে যাঁহারা 'সাহিত্য' বলেন, তাঁহারা অর্থ হইতে প্রাধান্য লক্ষ্য করিয়াই ঐরূপ বলিয়া থাকেন। অর্থের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। কেননা, শব্দ ও অর্থকে কখনও বিশ্লিষ্ট করা যায় না, তাহারা অবিচ্ছেদ্য। প্রাচীন বৈয়াকরণ আচার্য ভগবান্ ভর্তৃহরি বলিয়াছেন—

> জগতে এমন কোনও বিজ্ঞান সম্ভবপর নয়, যাহার সহিত শব্দ অনুস্যূত হইয়া নাই। সমস্ত জ্ঞানই শব্দের দ্বারা অনুবিদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে।[১]

এই মতবাদ কতদূর সত্য, তাহা আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানধারা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। যখনই আমরা কোনও অর্থ চিন্তা করি, তখনই আমাদের সেই অর্থের বাচক শব্দেরও জ্ঞান হইয়া থাকে। ইহা অনুভবসিদ্ধ। সেইজন্যই মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন—'বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ।' শব্দই জ্ঞান মাত্রের একমাত্র প্রকাশক। অর্থ জ্ঞান হইল, সে যেরূপেই হউক-না কেন, প্রত্যক্ষই হউক, অনুমানই হউক, অথবা স্মরণই হউক, অথচ বাচক শব্দের জ্ঞান হইল না— এইরূপ কল্পনা অযৌক্তিক।

---

১. "ন সোঽস্তি প্রত্যয়ো লোকে যঃ শব্দানুগমাদৃতে।
অনুবিদ্ধমিব জ্ঞানং সর্বং শব্দেন ভাসতে।"—বাক্যপদীয়।

বিখ্যাত মনীষী Benedetto Croce অর্থজ্ঞানের সহিত শব্দের এই অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন :

"...a thought is not thought for us, unless it be possible to formulate it in words ;...we do not say that the words must necessarily be declaimed in a loud voice... ; but it is certain that when a thought is really thought, when it has attained to the maturity of thought, the words run through our whole organism, soliciting the muscles of our mouth and ringing internally in our ears.. "[১]

এখন বুঝা গেল, শব্দ ও অর্থ কেন পরস্পর সম্বদ্ধ। কিন্তু অবিবিক্ত শব্দ ও অর্থের প্রাধান্যবিবেক কি করিয়া সম্ভবপর ? ইহার উত্তরে বলিব, চমৎকারিতা। চমৎকারিতাই এই প্রাধান্যবিচারের একমাত্র তুলাদণ্ড। শব্দ যেখানে অর্থ হইতে অধিকতর মনোজ্ঞ, সেখানে শব্দই প্রধান। অর্থ যেখানে শব্দঝংকার হইতে অধিকতর চমৎকারী, সেখানে অর্থই প্রধান। কিন্তু এই উভয় ক্ষেত্রে প্রকৃত সাহিত্যের লক্ষণ স্বীকার করা যায় কি না, তাহা লইয়া সমালোচক-গণের মধ্যে বিবাদের অন্ত নাই। অনেকে বলিবেন, কাব্য পাঠ করিবার সময় শব্দের মাধুর্যই প্রধানভাবে আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট করে, অর্থের দিকে প্রথমত আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে না। সংস্কৃতে জয়দেব-রচিত 'গীতগোবিন্দে'র কথাই ধরা যাউক। পদের সৌকুমার্য, ছন্দের লালিত্য, প্রকাশভঙ্গীর কোমলতাই সাধারণ পাঠকের হৃদয় বিমোহিত করিয়া তুলে, শ্রোতা তখনকার মত জয়দেবের কবিতার অর্থ বুঝিবার কথা ভুলিয়াই যায়। সাধারণ, 'গীতগোবিন্দে'র শ্রোতা বা পাঠককে যদি হঠাৎ কেহ প্রশ্ন করিয়া বসেন—মহাশয়, জয়দেবের এই কবিতাটির কি অর্থ বুঝিলেন ? তাহা হইলে উত্তর আসিবে "শব্দঃ শ্রুতোঽর্থো ন জ্ঞাতঃ"—আমি শব্দগুলিই শুনিয়াছি, অর্থের প্রতি লক্ষ্য করি নাই। বাংলা সাহিত্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় শব্দের এই চমৎকারিতা মুখ্যভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহা অস্বীকার করিবার

---

১. *The Essence of Aesthetic*, pp. 42-43.

উপায় নাই যে, কাব্যপাঠের সময় শব্দের মনোহারিতার দিকেই পাঠকের এবং শ্রোতার হৃদয় উন্মুখ হইয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া কেবলমাত্র মধুর শব্দ পর পর গাঁথিয়া গেলেই সাহিত্য সৃষ্টি করা যায়, এ কথা কোনও সাহিত্য-সমালোচকই স্বীকার করিবেন না। জয়দেব শব্দচয়নে—আপাতদৃষ্টিতে—কালিদাসের অপেক্ষা অধিকতর নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, সংস্কৃত ভাষার অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে তিনি যত মধুর শব্দ বাছিয়া তাঁহার গীতিমাল্য গ্রথিত করিয়াছেন। তথাপি কালিদাসের মেঘদূত, রঘুবংশ, কুমারসম্ভবের সহিত জয়দেবের গীতগোবিন্দের তুলনা হয় না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের সহিত সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-সঞ্চয়নের তুলনা হয় না। কেন? ইহার একমাত্র সমাধান এই যে, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থে শব্দ ও অর্থের চমৎকারিতা অন্যূনানতিরিক্ত। শব্দ এখানে অর্থের সহিত তুল্যস্কন্ধ হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। একটি অপরকে ছাপাইয়া উঠে নাই। মহাকবি কালিদাস তাঁহার 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকে কণ্বশিষ্য শার্ঙ্গরবের মুখ দিয়া দুষ্যন্ত ও শকুন্তলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "সমানয়ংস্তুল্যগুণং বধূবরং চিরস্য বাচ্যং ন গতঃ প্রজাপতিঃ"—বিধাতা তুল্যগুণ মহারাজ দুষ্যন্ত ও আশ্রমপালিতা শকুন্তলাকে বধূবররূপে সম্মিলিত করিয়া 'তিনি বিসদৃশ নরনারীর সম্মেলনের ঘটক' চিরকালের এই অকীর্তি হইতে মুক্ত হইলেন। দাম্পত্য-পরিণয়ের ক্ষেত্রে বধূবরের অবস্থাসাম্য গুণসাম্য বৃত্তিসাম্য যেমন সকল দিক দিয়া বাঞ্ছনীয়, শব্দার্থ-পরিণয়ের ক্ষেত্রেও সেই একই নিয়ম। স্বর্ণকারদুহিতার সহিত কর্মকারতনয়ের বিবাহ কখনই সুষ্ঠু ও সুখাবহ নহে। সংস্কৃত আলংকারিকগণ কাব্য-সংসারে কবিকে প্রজাপতির সহিত তুলনা করিয়াছেন, কোনও কোনও অংশে কাব্যস্রষ্টা কবির আসন বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতির আসনের বহু ঊর্ধ্বে।[১] সুতরাং কবিপ্রজাপতি যদি তাঁহার

১. "অপারে কাব্যসংসারে কবিরেকঃ প্রজাপতিঃ।
যথাস্মৈ রোচতে বিশ্বং তথৈব পরিবর্ততে॥"—ধ্বন্যালোক।

কাব্য-সংসারের শান্তি শৃঙ্খলা ও সৌষ্ঠব রক্ষা করিতে চাহেন, তবে শব্দার্থরূপী বধূবরের মিলনের মধ্যে যাহাতে কোনও বৈষম্য না থাকে, উভয়ের পরিণয় যাহাতে গুণসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি জাগ্রত রাখিতে হইবে, ইহাতে বৈচিত্র্য কি? খ্রীষ্টীয় দশম শতকের কাশ্মীরীয় আলংকারিক বক্রোক্তিজীবিত-কার আচার্য কুন্তক শব্দ ও অর্থের এই গুণসাম্য লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

সমসর্বগুণৌ সন্তৌ সুহৃদাবিব সঙ্গতৌ।
পরস্পরস্য শোভায়ৈ শব্দার্থৌ ভবতো (যথা)॥

—সর্ববিষয়ে সমান গুণশালী বন্ধুদ্বয় যেমন পরস্পরের শোভাবর্ধক, সেইরূপ কাব্যেও সদৃশ গুণবিশিষ্ট শব্দার্থযুগল পরস্পরের সৌন্দর্যের হেতু। সুতরাং অর্থের লঘুত্ব ও গৌরবের সহিত শব্দের মূর্ছনাও আরোহ হইতে অবরোহ পর্যন্ত ঝংকৃত হইবে। 'তোমার আপন সুর কখন ধ্বনিবে মন্দ্ররবে, কখন মঞ্জুল গুঞ্জরণে'। মহাকবিগণের বীণা সপ্ততন্ত্রী, একতন্ত্রী নহে। অপরিণত কবি শব্দ ও অর্থের এই অন্যূনানতিরিক্ত মনোহারিতা অটুট রাখিতে পারে না। হয় অর্থের গুরুত্ব ও সৌন্দর্যের সহিত শব্দের গাম্ভীর্য ও মনোহারিতা সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে পারে না; অথবা শব্দের সৌন্দর্য ও ঝংকার বাচ্য অর্থের সৌন্দর্যকে অতিক্রম করিয়া উঠে। পরিণত কবির হস্তে শব্দ ও অর্থের এই তুল্যস্কন্ধতা বা সৌহৃদ্য কখনও বিঘটিত হয় না এবং শব্দার্থের এই সৌহৃদ্য বা বিশিষ্ট 'সাহিত্য' হইতেই সাহিত্য-সংজ্ঞার উৎপত্তি।[১]

আরও এক প্রকারে সাহিত্য-সংজ্ঞার ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করা যাইতে পারে। কবি কিসের জন্য কাব্য রচনা করেন? আদি কবি বাল্মীকি রামচন্দ্রের জীবনপট কি জন্য শব্দে অঙ্কিত করিতে গেলেন? কালিদাসই বা কি জন্য বিরহী যক্ষের ব্যাকুল আবেদন তাঁহার অনবদ্য মন্দাক্রান্তায় গ্রথিত করিবার জন্য ব্যগ্র

১. "সাহিত্যমনয়োঃ শোভাশালিতাং প্রতি কাঽপ্যসৌ।
অন্যূনানতিরিক্তত্ব-মনোহারিণ্যবস্থিতিঃ॥"—বক্রোক্তিজীবিত, ১.১৭

হইয়া উঠিলেন? সংস্কৃত আলংকারিক আচার্য অভিনবগুপ্ত কাব্যরচনোন্মুখ মহাকবি বাল্মীকির চিত্তকে পরিপূর্ণ উচ্ছলিত কুম্ভের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ক্রৌঞ্চবিরহকাতরা চক্রবাকীর শোক বাল্মীকির কবিহৃদয়কে পূর্ণ, আলোড়িত করিয়াছিল—বর্ষাসমাগমে জলরাশি যেমন পরিপূর্ণ সরোবর-বক্ষ আলোড়িত করিয়া তুলে। ক্রৌঞ্চপত্নীর অন্তর্গূঢ় শোক মহর্ষি বাল্মীকির হৃদয়ে সংক্রান্ত হইয়াছিল এবং মহর্ষি বাল্মীকির উদ্বেলিত চিত্ত হইতে শোক শ্লোকাকারে উচ্ছলিত হইয়া পাঠকের হৃদয়কন্দর পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে—যেমন জলাশয় হইতে পরীবাহনিষ্ক্রান্ত জলধারা পার্শ্ববর্তী পল্বল-রাজিকে পরিপূর্ণ করে। এই প্রকারে যক্ষের বিপ্রলম্ভব্যথা মহাকবি কালিদাসের অন্তরকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছিল এবং কবি মেঘদূতের মন্দাক্রান্তায় তাঁহার সেই উচ্ছলিত বিয়োগব্যথা শতধারায় প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন, পাঠকের চিত্তকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য। এই ভাবে একের চিত্তবৃত্তি অন্যে সংক্রান্ত হইয়াছে,—নায়কের চিত্তবৃত্তি কবিতে এবং কবি হইতে সহৃদয় পাঠকের হৃদয়ে। এক প্রদীপ হইতে বহ্নিশিখা যেমন অন্য প্রদীপে সঞ্চারিত হয়, ঠিক সেইরূপে। "নায়কস্য কবেঃ শ্রোতুঃ সমানোঽনুভবস্ততঃ"। এই প্রকারে নায়ক, কবি ও সহৃদয়ের মধ্যে যে চিত্তসাম্য বা ভাবসাহিত্য ঘটে, তাহাই কবিকর্মের সাহিত্য ব্যপদেশের মূলে। যেখানে এই ভাবসাহিত্য ঘটে নাই, সেখানে সাহিত্যের লক্ষণ অটুট থাকিতে পারে না,—যতই না কেন শব্দসম্পদ্ ও অর্থগৌরব সেখানে থাকুক। কেন না, কবিহৃদয় সেখানে স্বতই অপূর্ণ রহিয়াছে, সহৃদয়ের চিত্ত পরিপূর্ণ করিবার মত রসসম্ভার তাহাতে সঞ্চিত হয় নাই। সুতরাং শব্দার্থ-গরিমা যে কেবল রিক্ত-কুম্ভের নিঃস্বন মাত্র হইবে,—তাহা যে উচ্ছলিত রসধারার গম্ভীর কল্লোল হইবে না, ইহাতে আশ্চর্য কি? সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্য-মীমাংসক 'হৃদয়দর্পণ'-কার আচার্য ভট্টনায়ক সেইজন্য যথার্থই বলিয়াছেন, "যাবৎ পূর্ণো ন চৈতেন তাবন্নৈব বমত্যমুম্"। আধুনিক বিখ্যাত সমালোচক

অধ্যাপক Lascelles Abercrombie তাঁহার *Principles of Literary Criticism* গ্রন্থে সাহিত্যের লক্ষণ সম্বন্ধে ঠিক একই কথা বলিয়াছেন—

"We have seen that every work of literature originates in an experience. It may be any sort of experience: Something may have happened to the author in actual life, or he may have heard a story of something, or some phantasy may have flashed into his mind. But it must be an experience peculiar in one respect; it must be of a kind to take hold of him and to demand utterance. There might be nothing extraordinary in an experience that merely urged him to express himself, there must be something extraordinary in any experience that urges him to express himself to perfection, and in a way that will also represent his experience to another mind....

"When Shakespeare heard (or read) the story of *Othello*, he took it as a single experience; the whole matter and import of the tale was seized by him, in a single act of imaginative attention. The wealth of matter in this experience of his is expressed by the texture of the play; but the final impression of the completed play brings all this wealth of matter in our minds into a single intensity of experience, a single act of imaginative attention, the excitement of which corresponds (so far as we are able to correspond) with the energy of Shakespeare's inspiration."

এখানেও সেই নায়ক, কবি ও সহৃদয়ের চিত্তের ভাবসাম্যের কথাই বলা হইয়াছে, যাহা হইতে সাহিত্য-সংজ্ঞার উৎপত্তি। কিন্তু যদিও এই ভাব-সাহিত্যের উৎপত্তি বিষয়ে কবির প্রতিভা ও শব্দার্থ-যোজনায় তাঁহার কৃতিত্বই মূল উপাদান, তথাপি পাঠকচিত্তের প্রবণতার উপর ইহার অনেকখানি নির্ভর করে। তাই সাহিত্যের সাফল্যের জন্য পাঠকের সহৃদয়তাও সমানভাবে আবশ্যক। আচার্য অভিনবগুপ্ত এই সহৃদয়তার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাৎ বিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয়তন্ময়ীভবনযোগ্যতা তেঽত্র হৃদয়সংবাদভাজঃ সহৃদয়াঃ।"

কাব্যানুশীলনের অভ্যাসবশে যে সকল পাঠকের মনোবৃত্তি নির্মল আদর্শের ন্যায় স্বচ্ছতা লাভ করিয়াছে এবং যাঁহারা কবিবর্ণিত কাব্যবস্তুর সহিত নিজ

নিজ চিত্তবৃত্তিকে অভিন্ন করিয়া তুলিবার যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই সহৃদয়।

কবির মনোমুকুরে কাব্যবস্তুর যে বিম্ব উৎপত্তিলাভ করিয়াছে, সহৃদয় পাঠকের বিশদ চিত্তাদর্শে যখন তাহারই নিখুঁত প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইবে, কবির চিত্তবীণায় যে মূল রাগিণী ঝঙ্কৃত হইতেছে, সহৃদয়ের হৃদয়তন্ত্রীও যখন তাহারই সুরে অনুরণিত হইয়া উঠিবে, তখনই কবিকর্ম সার্থক। সেই জন্যই আচার্য অভিনবগুপ্ত তাঁহার লোচন-ব্যাখ্যার উপোদ্‌ঘাতে মঙ্গলাচরণ শ্লোকে বলিয়াছেন—

সরস্বত্যাস্তত্ত্বং কবিসহৃদয়াখ্যং বিজয়তে।

কবির ভাষায়—

তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ
তবে সে কলতান উঠে।
বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে
তবে সে মর্মর ফুটে।

'সাহিত্যে'র এই শেষোক্ত ব্যুৎপত্তি স্বীকার করিয়া লইলে কেবলমাত্র শব্দাত্মক কবি-সৃষ্টিই যে সাহিত্যের গণ্ডির মধ্যে পরিগণিত হইবে, তাহা নহে, যদিও লৌকিক ব্যবহারে ভাষানিবদ্ধ গদ্য-পদ্যাত্মক সৃষ্টিকেই মুখ্যত 'সাহিত্য'—এই সংজ্ঞার দ্বারা নির্দেশ করা হইয়া থাকে। 'সাহিত্যে'র পরিসর আরও ব্যাপক। ভাষাই কেবলমাত্র ভাবুকের অন্তর্গূঢ় চিত্তবৃত্তির প্রকার, পরচিত্তের সহিত কবিচিত্তের সংযোগ বা সাহিত্য স্থাপনের একমাত্র মাধ্যম নহে। চিত্র, সঙ্গীত, ভাস্কর্য প্রভৃতি ললিতকলাও কবি-মনের প্রকাশের বিভিন্ন ভঙ্গি। কালিদাস বা শেক্‌সপীয়র যেখানে নিজ নিজ অনুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য শব্দকেই উপাদানরূপে নির্বাচন করিয়াছেন, রাফেল, মাইকেল এঞ্জলো, ভ্বাগনার প্রভৃতি কলাবিদ্‌গণ সেখানে যথাক্রমে বর্ণিকা, মর্মর ও রাগিণীকে স্ব স্ব অনুভূতি প্রকাশের উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। উদ্দেশ্য

একই—প্রকাশভঙ্গিই কেবলমাত্র বিভিন্ন। সুতরাং রাফেল, মাইকেল এঞ্জেলো, হ্বাগনার,—কালিদাস বা শেক্‌সপীয়রের সমগোত্রীয়, তাঁহারাও কবি। সম্রাট শাহ্‌জাহান এই হিসাবে জগতের শ্রেষ্ঠ কবিগোষ্ঠীর একজন এবং তাঁহার সৃষ্টি তাজমহল জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যরূপে গণিত হইবার যোগ্য। লক্ষ্য করিবার বিষয়, আচার্য কুন্তক তাঁহার 'বক্রোক্তি-জীবিত' গ্রন্থে স্পষ্টভাবেই কবি ও চিত্রকরকে সমপর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন—

"তস্মাদেব চ কাব্য-কাব্যোপকরণ-কবীনাং চিত্র-চিত্রোপকরণ-চিত্রকরৈঃ সাম্যং প্রথমমেব প্রতিপাদিতম্"।

এক্ষণে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। তাহাই যদি হয়, তবে মৌনী ভাবুকের অন্তর্গূঢ় চিন্তাধারাও তো সাহিত্যরূপে গণিত হইবার যোগ্য? বাল্মীকি যদি রামায়ণ শ্লোকাকারে নিবদ্ধ না করিতেন, কালিদাস যদি তাঁহার মেঘদূতের কাহিনী বিরহগাথায় গ্রথিত না করিতেন, মাইকেল এঞ্জেলো যদি তাঁহার চিত্তনিহিত সৌন্দর্যের আদর্শ শ্বেতমর্মরের উপর প্রতিবিম্বিত না করিতেন, তবে কি তাঁহাদের কবিত্ব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইত? তাঁহাদের সকলের অন্তরের মধ্যে তো অস্ফুট শব্দ ও অব্যক্ত অর্থ—একতা প্রাপ্ত হইয়াছে; কবি-ভাস্করের চিত্তপাষাণফলকেই তো সৌন্দর্য আপনাকে প্রতিফলিত করিয়াছে; এবং ইহাই তো আদর্শ সাহিত্য। সেখানে কবি ও শ্রোতা এক, ভাস্কর ও দর্শক সেখানে অভিন্ন। মৌনী ভাবুকহৃদয় সেখানে নিজেকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়াছে—কবি, ভাস্কর ও চিত্রকররূপে সে স্রষ্টা, শ্রোতা ও দর্শকরূপে সে সহৃদয়ের সহিত তাদাত্ম্যাপন্ন। অতএব অলিখিত কাব্য, অচিত্রিত আলেখ্য, অগীত রাগিণী—এ সকলই কি 'সাহিত্য'? সংস্কৃত আলংকারিক সম্প্রদায় ইহার সমাধান অতি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অভিনবগুপ্তের সাহিত্যগুরু আচার্য ভট্টতৌত তাঁহার অধুনালুপ্ত 'কাব্যকৌতুক' গ্রন্থে বলিয়াছিলেন—

নানৃষিঃ কবিরিত্যুক্তমৃষিশ্চ কিল দর্শনাৎ।
বিশুদ্ধভাবনাজ্ঞানতত্ত্বপ্রখ্যা চ দর্শনম্॥
দর্শনাদ্ বর্ণনাচ্চাপি রূঢ়া লোকে কবিশ্রুতিঃ।
তথাহি দর্শনে স্বচ্ছে নিত্যেঽপ্যাদিকবের্মুনেঃ।
নোদিতা কবিতা লোকে যাবজ্জাতা ন বর্ণনা॥

আদিকবি বাল্মীকির কবিদৃষ্টি যদিও শাশ্বত ও অপ্রতিহত, তথাপি ততদিন জগতে (রামায়ণ) কবিতার উদ্ভব হয় নাই, যতদিন না তিনি তাঁহার মানসোপলব্ধ রামায়ণ-কাহিনী ভাষায় বর্ণনা করিতে পারিয়াছিলেন।

অতএব মৌনী কবির কবিত্ব তাঁহার নিজদৃষ্টিতে হয়তো অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে, তিনি নিজেই হয়তো তাঁহার অপ্রকাশিত কাব্যের স্রষ্টা ও রসয়িতা হইতে পারেন; তখন তিনি 'হৃদয়কবি'।[১] কিন্তু লৌকিক দৃষ্টিতে কবিত্ব তখনই সার্থক, যখন কবি তাঁহার স্বোপলব্ধ অনুভূতি ভাষায় বর্ণনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন; চিত্রকরের সৃষ্টিশক্তির চরম পরিপূর্ণতা তখনই, যখন তিনি অন্তরের আলেখ্য বাহ্য বর্ণসমাবেশের দ্বারা চিত্রে রূপায়িত করিতে পারিয়াছেন; ভাস্কর্য তখনই সফল, যখন ভাস্কর তাঁহার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যমূর্তি পাষাণবক্ষে প্রতিফলিত করিয়া বিশ্বের দর্শকসমাজের উদ্দেশে উপহার দিতে পারিয়াছেন।[২] শব্দই কবিত্বের বাহ্যপ্রকাশ, তাহার মধ্য দিয়াই কবিত্ব মূর্তি

১. 'যো হৃদয় এব কবতে নিহ্নুতে চ স হৃদয়কবিঃ'—রাজশেখরঃ 'কাব্যমীমাংসা', পৃ. ১৯ (GOS. Edition)

২. "Thought, musical fancy, pictorial image, did not indeed exist without expression, they did not exist at all, previous to the formation of this expressive state of the spirit. To believe in their pre-existence is simplicity, if it be simple to have faith in those impotent poets, painters, musicians, who always have their heads full of poetic, pictorial, and musical creations, and only fail to translate them into external form, either because, as they say, they are impatient of expression, or because technique is not sufficiently advanced to afford sufficient means for their expression ..."—Benedetto Croce: *The Essence of Aesthetic*, p. 43.

পরিগ্রহ করে। এই শব্দকে পৃথক করিয়া লইলে কবিত্ব অশরীরী আত্মার ন্যায় অপ্রত্যক্ষ, অগম্য, অনুপলভ্য। এইজন্যই প্রাচীন আলংকারিক আচার্য দণ্ডী বলিয়াছেন,—'শরীরং তাবদিষ্টার্থ-ব্যবচ্ছিন্না পদাবলী।'[১] অনেকের মতে শব্দ শুধু কাব্যের শরীর নহে,—অর্থবোধক শব্দসমষ্টি হইতে ব্যতিরিক্ত কাব্যবস্তুর পৃথক চৈতন্য বা আত্মা বলিয়া আর কিছুই নাই। যেমন, ভূতচৈতন্যবাদী লৌকায়তিকগণের মতে মহাভূতসমষ্টি হইতেই প্রাণিচৈতন্যের উদ্ভব, বিজ্ঞানমাত্রসার আত্মবস্তুর অন্য কোনও পৃথক সত্তাই নাই। কাব্যবস্তুর চৈতন্য বা আত্মার পৃথক অস্তিত্ব আছে কি না,—সে প্রশ্নের পরবর্তী আলোচনায় মীমাংসা করা যাইবে। কিন্তু ইহা ঠিক, শরীরকে বাদ দিয়া আত্মার কোনও নিরাকার অস্তিত্ব সাধারণ বুদ্ধির অগোচর। পালিভাষায় রচিত 'মিলিন্দপঞ্‌হো' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে মহারাজ মিলিন্দ ও ভদন্ত নাগসেনের মধ্যে একটি সংলাপ লিপিবদ্ধ আছে। ভদন্ত নাগসেন সেখানে মহারাজ মিলিন্দকে প্রশ্ন করিতেছেন, মহারাজ! আপনি যে রথে আরোহণ করিয়া আমার এই আশ্রমে উপনীত হইলেন, সেই রথ কি প্রকার? মহারাজ, ঈষাই কি কেবলমাত্র রথ? অথবা কেবল অক্ষ, অথবা চক্রসমূহ, অথবা রথদণ্ড, কিংবা তাহাদের সমষ্টি? মহারাজ উত্তর করিলেন, ভদন্ত নাগসেন, ইহারা এক-একটি রথ নয়, ইহাদের সমষ্টিরও রথসংজ্ঞা নয়। নাগসেন জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে কি মহারাজ! ঈষা, অক্ষ, চক্র, রথদণ্ড এবং ইহাদের সমষ্টি ব্যতিরিক্ত অন্য কোনও বস্তু রথ বলিয়া আপনার ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া থাকে? মিলিন্দ কহিলেন, তাহাও নহে। নাগসেন তখন ঈষৎ পরিহাসচ্ছলে রাজাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! তবে কি আপনি রথে আরোহণ করিয়া আমার আশ্রমে আসেন নাই? মহারাজ মিলিন্দ তখন নির্বাক।

১. "...If we take from a poem its metre, its rhythm, and its words, poetical thought does not, as some opine, remain behind: there remains nothing. Poetry is born as those words, that rhythm, and that metre."—Benedetto Croce: *The Essence of Aesthetic*, p. 43

শব্দাত্মক সাহিত্যের স্বরূপ বিচারের ক্ষেত্রেও তূষ্ণীম্ভাবই শেষ পর্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। সত্য বটে, কাব্যের শরীররূপী শব্দ, ছন্দঃ, অলঙ্কার, রীতি, গুণ,—এই সকল উপাদান পৃথকভাবে বিশ্লিষ্ট করিয়া লইলে, কাব্যবস্তুর উপলব্ধিগোচর আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু শব্দ, ছন্দঃ, অলঙ্কার, রীতি ও গুণ এই কয়টির সমষ্টিই যে কাব্যের নিঃশেষ উপাদান, ইহাতেও সহৃদয়ের চিত্ত সায় দিবে না। শব্দ, রীতি, গুণ প্রভৃতির মধ্য দিয়াই তাহার প্রকাশ, অথচ তাহা শব্দ রীতি প্রভৃতির সহিত অভিন্ন নহে। প্রাতিভ চক্ষু (intuition) দ্বারা যাহা বোধগম্য, তাহাকে বিচারবুদ্ধি ও বিশ্লেষণের দ্বারা বর্ণনা করা দুরূহ। কাব্যশরীর বিশ্লেষণ ও বিচারবুদ্ধির দ্বারা বেদ্য, কিন্তু তাহার আত্মা অনুভবগম্য। তাহাকেও অপহ্নব করা সম্ভবপর নহে। 'যুক্ত্যা পর্যনুযুজ্যেত স্ফুরন্নসুভবঃ কয়া' ?

সাহিত্য ও রসতত্ত্ব

১. বিভাব, অনুভাব, স্থায়িভাব, সঞ্চারিভাব

নাট্যশাস্ত্রের প্রবক্তা আচার্য ভরত 'রস'কে সাহিত্যের বীজরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। 'রস'বীজ হইতে কাব্যের উৎপত্তি। আবার 'রস'ই কাব্যের ফল—কেন না, কাব্যপাঠের পরিসমাপ্তি রসানুভূতিতে, সহৃদয়ের রসচর্বণায়। এই রসের স্বরূপ কি? 'রস' কাহাকে বলে? সংস্কৃতে 'রস্' ধাতুর অর্থ 'আস্বাদন', এই 'রস' ধাতু হইতেই 'রস'-শব্দের উৎপত্তি। সুতরাং যাহাকে আস্বাদন করা যায়, তাহাই 'রস্'। মধুর, অম্ল, কটু, তিক্ত, কষায়, লবণ—এই সকলই 'রস', কেন না, বাহ্য জিহ্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা উহাদিগকে আস্বাদন করা যায়। সেই জন্যই জিহ্বার অপর নাম 'রসনা'—কেন না, উহার দ্বারা উপরোক্ত ছয়টি বিভিন্ন রসের আস্বাদন সম্ভবপর হইয়া থাকে, উহা আস্বাদনের করণ (instrument, organ)। সাহিত্য-রসের ক্ষেত্রেও ব্যুৎপত্তি একই। এখানেও সেই আস্বাদনই অর্থ। শৃঙ্গার, করুণ, হাস্য, বীভৎস প্রভৃতি 'রস' সমস্তই আস্বাদ্য, কিন্তু বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নহে। সাহিত্যরসের উপযুক্ত রসনেন্দ্রিয় সহৃদয়ের অন্তরিন্দ্রিয়, তাঁহার অনুভূতিপ্রবণ চিত্ত। সাহিত্যিক 'রস' মধুর প্রভৃতি রসের ন্যায় বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, উহা আন্তরেন্দ্রিয়বেদ্য। উহা সাহিত্যের অন্তরতম তত্ত্ব, ঔপনিষদিক ব্রহ্মের মত উহার স্বরূপ গুহানিহিত—'নিহিতং গুহা যৎ'। ভাষার দ্বারা উহাকে স্পর্শমাত্র করা যায়; উহার প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয় কেবল তাঁহারই নিকট, যিনি উহার অপরোক্ষ মানস অনুভূতি লাভ করিতে পারিয়াছেন।

এই তো গেল 'রস'-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত (etymological) অর্থ। কিন্তু রসাস্বাদের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি কি? সহৃদয় শ্রোতা, দর্শক বা পাঠক কি করিয়া অভিনয়দর্শনে বা কাব্যপাঠশ্রবণে রসতত্ত্ব অনুভব করিয়া থাকেন? সেই

রসানুভবের নিগূঢ় তথ্যই বা কি? কাব্যপাঠ বা অভিনয়দর্শন হইতে যে রসবোধ হইয়া থাকে, তাহা কি শুধু আনন্দেরই জনক, না, দুঃখময় অনুভূতিও উহা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে? যদি আনন্দই রসানুভূতির ফল হয়, তবে সে আনন্দের স্বরূপ কি? সাধারণ লৌকিক আনন্দ বা হর্ষ হইতে উহার কি কোনও বৈলক্ষণ্য আছে? রসের শ্রেণীবিভাগ সম্ভবপর কি না? যদি সম্ভবপর হয়, তবে সাহিত্যিক রসের সংখ্যা কয়টি? ঐরূপ বিভিন্নতার কারণই বা কি। এ সকল প্রশ্নই অতি দুরূহ। প্রাচীন সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ তাঁহাদের মনঃসমীক্ষণ বা অনুব্যবসায় (introspection) বলে তাঁহাদের স্ব স্ব মানসিক বৃত্তিগুলির নিগূঢ় বিশ্লেষণ করিয়া রসের স্বরূপ মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা তখন আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষণপদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন মানবের মনোবৃত্তির সূক্ষ্ম পরিমাপ, তাহার গতি ও প্রকৃতি নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই। দুরূহ রসতত্ত্বের গবেষণার ক্ষুরধার পথে তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল আত্মসমীক্ষণশক্তির তীক্ষ্ণতা। ইহারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তাঁহারা অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রাচীন রীতির সহিত আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও গবেষণাপদ্ধতির সংযোগ ঘটাইতে পারিলে রসতত্ত্বের একটা আধুনিক রুচিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি উদ্ভাবন করা সম্ভবপর হইতে পারে।

রসতত্ত্বের সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, ইহা শব্দের 'অভিধা' শক্তির (function of denotation) দ্বারা প্রকাশ্য নহে। 'রস'কে কখনও কোনও উপায়েই স্পষ্ট কথায় প্রকাশিত করা যায় না। হাস্যরসের অভিনয় দেখিতে গিয়া যদি অভিনেতৃবর্গের পরস্পরের মুখে কেবলই শুনা যায়—'ইহা বড় হাসির কথা', 'আমার বড় হাসি পাইতেছে', তখন প্রেক্ষকবর্গের বদনকমল হইতে যে সকল অমৃতময় বাণী নটগোষ্ঠীর উদ্দেশে বর্ষিত হইতে থাকে, তাহা আদৌ হাস্যরসের অনুরূপ নহে। বাইবেলে আছে, বিধাতা আদেশ করিলেন, 'আলোক হউক', অমনই আলোকের দ্বারা বিশ্ব উদ্ভাসিত হইল। কবি তাঁহার

কাব্যে 'রস হউক' বলিয়া আদেশ করিলেই সহৃদয়ের চিত্তে রসবন্যার প্রাদুর্ভাব হয় না। 'গো' শব্দ শ্রবণ করিলেই যেমন একটি প্রতিনিয়ত প্রাণিবিশেষরূপ অর্থের বোধ হইয়া থাকে, সেইরূপ 'শৃঙ্গার' শব্দটি শ্রবণ করিলেই যদি শ্রোতার হৃদয়ে শৃঙ্গাররসের আবির্ভাব হইত, তবে রস বাচ্য হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা তো অনুভূত হয় না। বস্তুত যেখানে কোনও বিশিষ্ট রসের বাচক শব্দের দ্বারা সেই রসকে প্রকাশ করা হইয়া থাকে, সেইরূপ স্থলে আলঙ্কারিকগণ কবি-প্রতিভার ন্যূনতা লক্ষ্য করিয়া উহাকে কাব্যদোষের মধ্যে অন্তর্ভূত করিয়াছেন। সুতরাং 'রস' বাচ্য নহে। তবে ইহা কি? সাহিত্য-মীমাংসকগণ রসকে 'ব্যঙ্গ্য' বলিয়াছেন, "স এষ পরমো ব্যঙ্গ্যঃ"। 'ব্যঞ্জনা'র দ্বারা রসের বোধ হইয়া থাকে, এবং আভাস ও ইঙ্গিতের দ্বারা প্রকাশ করাই ব্যঞ্জনা-শক্তির বৈশিষ্ট্য। কবি যখন 'করুণ'রসের অবতারণা করিতে যান, তখন কেবলমাত্র হা-হুতাশের দ্বারা তাঁহার কাব্য পূর্ণ করেন না। করুণ রসের ব্যঞ্জনার উপযোগী সামগ্রী তাঁহার কাব্যে সমাবেশ করিয়া থাকেন এবং এই সামগ্রীর যথোপযুক্ত সমাবেশের দ্বারাই কবি সহৃদয় শ্রোতার হৃদয়ে অভিলষিত রস অভিব্যক্ত করিতে সমর্থ হন। রসাভিব্যক্তির এই সামগ্রী কি? ভরতাচার্য তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে এই সামগ্রীর চারিটি বিশিষ্ট বিভাগ বা শ্রেণী নির্দেশ করিয়াছেন। বিভাব, অনুভাব, স্থায়িভাব এবং সঞ্চারিভাব। ইহাদের প্রত্যেকটিই রসানুভূতির অপরিহার্য উপাদান। বিভাব ও অনুভাব রসাভিব্যক্তির বাহ্য উপাদান, উহারা জড়জগতের অন্তর্ভুক্ত। বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা উহাদের উপলব্ধি সম্ভবপর। স্থায়িভাব ও সঞ্চারিভাব, রসচর্বণার আন্তর উপাদান, উহারা সহৃদয়ের মনোজগতের সহিত সংশ্লিষ্ট। সুতরাং উহাদের স্বরূপবিচার পরভাবী।

'বিভাব' শব্দের অর্থ 'কারণ'। কিসের 'কারণ'? রসানুভূতির। মানবের চিত্তবৃত্তির সহিত জড়জগতের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান। সাধারণ দৃষ্টিতে মনোজগতের সহিত জড়জগতের কোন সম্বন্ধই যেন নাই। ইহারা যেন

পরস্পর-অসংশ্লিষ্ট নিরপেক্ষ পদার্থ বলিয়া প্রতিভাত হয়। কিন্তু জড় (matter) ও চৈতন্যের (spirit, mind) মধ্যে এই শাশ্বত দ্বন্দ্বের সমন্বয়সাধনই সমস্ত দর্শনের চরম লক্ষ্য। দার্শনিক পণ্ডিতগণের মনীষা এই দুরূহ সমস্যার সমাধানের জন্যই নিয়োজিত হইয়াছে। জড় ও চৈতন্যের পৃথক ও সমান্তরাল (parallel) সত্তা স্বীকার করিয়া লইলেও উহাদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। সে সম্বন্ধের নাম, কার্যকারণভাব (causality)। চন্দ্রোদয়দর্শনে আমাদের চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠে, সমুদ্রবক্ষের মত স্ফীত হইয়া উঠে; জনহীন মরু-প্রান্তর আমাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করে; অসংখ্যনক্ষত্রমালাবিভূষিত ছায়াপথখণ্ডিত শারদাকাশের সীমাহীন গভীরতা আমাদের চিত্ত বিহ্বল করিয়া তুলে, আমরা বিধাতার বিশ্বসৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া স্তম্ভিত হই, বিস্মিত হই। এই সমস্তই মানবপ্রকৃতির উপর জড়জগতের সুদূর-প্রসারী প্রভাবের নিদর্শন। জড়প্রকৃতির এই দুষ্প্রতিরোধ লীলাকে লক্ষ্য করিয়াই প্রসিদ্ধ সাহিত্যমীমাংসক আচার্য অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—"অয়ি জড়প্রকৃতি! তুমি তোমার প্রকৃত সত্তাকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া জনগণের হৃদয়কে লইয়া নানা ভঙ্গিতে ক্রীড়া কর, তাহাকে অলক্ষ্যে আক্রমণ করিয়া কত বিবিধ বিলাসে নাচাইতে থাক! অথচ বিশ্বের জনসমাজ নিজের সহৃদয়তার অভিমানে তোমাকেই 'জড়', 'অচেতন' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। আমার মনে হয়, ইহাই সমীচীন, কেন না, জনসমাজই প্রত্যুত 'জড়'। সুতরাং তাহাদের যদি 'জড়' এই আখ্যার দ্বারা নির্দেশ করা হইত, তবে তোমার সহিত তাহারা সমান হইয়া উঠিত। উহাতে কেবল তাহাদের স্তুতিই হইত, নিন্দা নয়।"

আবার কাহাকেও দেখিয়া হয়তো আমরা কুপিত হই, কাহাকেও দেখিয়া আমাদের হৃদয়ে স্নেহের প্রবাহ বহিতে থাকে। অতএব আমাদের বিভিন্ন পরিবর্তনশীল চিত্তবৃত্তি এই সকল জড়জগতেরই কার্য, জড়প্রকৃতি উহার কারণ। এই সকল কারণকলাপই যখন কবি তাঁহার প্রতিভাবলে কাব্যে বর্ণনা করেন,

তখন ইহাদের 'বিভাব' এই সংজ্ঞার দ্বারা নির্দেশ করা হইয়া থাকে। লৌকিক ব্যাবহারিক জগতে যখন আমরা ব্যাঘ্র প্রভৃতি দেখিয়া ভীত হই, প্রিয়ার সন্দর্শনে প্রেমাকুলহৃদয় হই, তখন ব্যাঘ্র প্রভৃতি কেবলমাত্র আমাদের চিত্তবৃত্তির প্রতি কারণ, অলৌকিক কারণ মাত্র। কিন্তু কাব্যপাঠজনিত সহৃদয়ের চিত্তে যে অনুভূতির সঞ্চার হয়, উহা লৌকিক অনুভূতি। 'মেঘনাদবধ-কাব্য' পাঠ করিয়া যে 'উৎসাহ' আমাদের হৃদয়ে অভিব্যক্ত হইয়া উঠে, যে বীররসের সঞ্চার হয়, উহা লৌকিক 'উৎসাহে'র সহিত সমপর্যায়ের নহে। দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী', অথবা মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রভৃতি প্রহসন-নাট্যের অভিনয়দর্শনে আমাদের চিত্ত হাস্যরসের আবেগে যে বিকশিত হইয়া উঠে, উহার সহিত সার্কাসের বিদূষকের (clown) মুখভঙ্গি ও অঙ্গবিকারজনিত কৌতুকময় অনুভূতির তুলনা হয় না। মোট কথা, কবিকর্মজনিত যে সকল ভাববিবর্তন আমাদের মনোজগতে লক্ষিত হইয়া থাকে উহারা সর্বথা অলৌকিক, উহাদেরই 'রস' এই বহুমানসূচক সংজ্ঞার দ্বারা ব্যপদেশ করা হইয়া থাকে। লৌকিক ভীতি, লৌকিক শোক, লৌকিক হাস্য, লৌকিক প্রীতির সহিত কবিকর্মসমুদ্ভূত ভয়ানক করুণ হাস্য অথবা শৃঙ্গার -রসের একীকরণ কখনই সম্ভবপর নহে। কবিপ্রতিভার ইহাই অলৌকিকত্ব। এই অলৌকিক প্রতিভাশক্তির স্পর্শেই ব্যাবহারিক জগতে লৌকিক ভীতির ব্যাঘ্র প্রভৃতি যে সকল সাধারণ 'কারণ', তাহাই কাব্যজগতের 'বিভাব'রূপে পরিণত হয়। কাব্যজগতের অন্তর্ভূত কার্য কারণ সমস্তই অলৌকিক,—রস অলৌকিক, বিভাব অলৌকিক, সমুদায়ের মূলে আছে অলৌকিক প্রতিভার স্ফুরণ। সুতরাং ব্যাবহারিক জগতের যাহা কারণমাত্র, কবিকর্মের কাল্পনিক বিশ্বে তাহাই 'বিভাব'। উভয়ে সমগোত্রীয় হইলেও অভিন্ন নহে। একটি লৌকিক, অপরটি অলৌকিক। একটি বিধাতৃবিরচিত বিশ্বের দুর্লঙ্ঘ্য কার্যকারণশৃঙ্খলার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, অপরটি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত, মম্মটাচার্যের ভাষায় 'নিয়তিকৃত-নিয়মরহিত', কবিপ্রজাপতির শৃঙ্খলহীন যদৃচ্ছাই উহার একমাত্র নিয়ামক,

জড়জগতের নিয়ম উহাদের স্পর্শ করিতে পারে না, উহারা 'নিয়মের রাজত্বে'র বহু ঊর্ধ্বে অবস্থিত।

এই 'বিভাব' বা সাহিত্যিক কারণকলাপ আবার দুইটি বিশিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত—একটির নাম 'আলম্বন'বিভাব, অপরটির নাম 'উদ্দীপন'বিভাব। আলম্বন শব্দের অর্থ বিষয়,—অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির বিষয়। আমাদের চিত্তের যত কিছু বৃত্তি বা বিকার (modification), তাহা কোনও না কোনও একটি নির্দিষ্ট বস্তুকে অবলম্বন করিয়া উদ্ভূত হয়। যখন ঘটজ্ঞান হইল,—তখন আমাদের চিত্তের যে জ্ঞানাত্মক পরিণাম (consciousness) সংঘটিত হইল, উহার 'আলম্বন' বা বিষয় একটি নির্দিষ্ট ঘট। মোট কথা, আলম্বন বা বিষয়ই আমাদের চিত্তবৃত্তির মুখ্য কারণ। 'ঘট' না থাকিলে উহাকে আলম্বন করিয়া যে ঘটবিষয়ক জ্ঞান জন্মাইল, তাহা আদৌ সম্ভবপর হইত না। সাহিত্যক্ষেত্রেও সহৃদয়ের যে রসাত্মক চিত্তবৃত্তি, তাহারও একটি বিশিষ্ট কারণ আছে। কোনও একটি বিশিষ্ট কারণকে আলম্বন করিয়াই ঐরূপ ভাববিকার বা emotion জন্মলাভ করে। ঐরূপ বিভাবকেই সাহিত্যমীমাংসকগণ 'আলম্বন-বিভাব' কহিয়া থাকেন। যেমন, 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকে দুষ্যন্তের হৃদয়ে যে রতিভাব বা শৃঙ্গাররসের আবির্ভাব বর্ণিত হইয়াছে,—উহার আলম্বনবিভাব শকুন্তলা। কেন না, শকুন্তলা-সন্দর্শনেই মহারাজ দুষ্যন্তের কামনা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। সেইরূপ, শকুন্তলাও দুষ্যন্তের দর্শনমাত্রেই তাঁহার প্রতি অনুরাগপরবশা হন। অতএব, আর একদিক হইতে আলোচনা করিলে শকুন্তলার ভাববিকারের 'আলম্বন-বিভাব' মহারাজ দুষ্যন্ত স্বয়ং। এইরূপে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলা পরস্পর পরস্পরের রতিভাবের প্রতি আলম্বন। অন্যান্য রসের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। 'বেণীসংহারে' ভীমের যে রৌদ্ররস, উহার আলম্বন-বিভাব দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ ও বস্ত্রহরণের অপমানজনক বীভৎস দৃশ্য। মেঘদূতের নির্বাসিত যক্ষের 'বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারে'র আলম্বন-বিভাব বিরহিণী যক্ষপত্নী। অপর পক্ষে, 'উদ্দীপন-বিভাব' ঠিক এইরূপ অর্থে আমাদের চিত্তবৃত্তির

প্রতি কারণ নহে। উদ্দীপন-বিভাব না থাকিলে আমাদের চিত্তবৃত্তি আদৌ জন্মলাভ করিত না—এইরূপ দাবি করা চলে না। যাহা অস্ফুট ছিল তাহাকে স্ফুট করা, যাহা অর্ধপ্রসুপ্ত ছিল তাহাকে সম্পূর্ণ জাগ্রত করা, যাহা মুকুলিত ছিল তাহাকে ফলিত করা, যাহা ছিল স্তিমিত তাহাকে সন্ধুক্ষিত করিয়া তোলাই উদ্দীপন-বিভাবের উপযোগিতা। ইংরেজীতে ইহাকে auxiliary cause বা সহকারি-কারণ বলা চলে। যেমন, সাহিত্যে প্রায়শই বসন্তের আবির্ভাব, প্রেমসঙ্গীত, নায়কনায়িকার অভিসারসজ্জার বর্ণনা শৃঙ্গাররসের অঙ্গরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে। এ সমস্তই নায়কনায়িকার প্রীতিকে অধিকতর উজ্জীবিত করিয়া তোলে,—নায়িকার চরণের নূপুরনিক্কণ, তাহার বলয়ের শিঞ্জিতধ্বনি প্রতীক্ষমাণ নায়কের হৃদয়কে চঞ্চল করিয়া তোলে। এই সকলই অনুভবসাক্ষিক। বর্ষাসমাগম বিরহের উদ্দীপন-বিভাব। কালিদাস তাঁহার মেঘদূতের অনবদ্য মন্দাক্রান্তায় ইহার উদ্বোধন চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন, যক্ষের বিরহবেদনাকে উদ্দীপিত করিবার জন্য—"আকুল করেছ শ্যাম সমারোহে হৃদয়সাগরউপকূল।" অতএব প্রত্যেক রসেরই একটি উপযুক্ত পরিবেশ আছে—এই পরিবেশের উদ্দেশ্য প্রতিপাদ্য রসের উৎকর্ষসাধন, এবং পরিবেশেরই আলঙ্কারিক সংজ্ঞা 'উদ্দীপন-বিভাব'।

অতএব, বিভাবের স্বরূপ বুঝা গেল। এক্ষণে 'অনুভাবে'র স্বরূপ আলোচনীয়। 'অনুভাব' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে 'পশ্চাৎ-(অনু)-ভাবিতা (ভাব)'। প্রশ্ন হইতে পারে: এই পাশ্চাত্য বা পরভাবিতা কাহাকে অপেক্ষা করিয়া? উত্তরে আলঙ্কারিকগণ বলিয়া থাকেন—লৌকিক ভাব বা চিত্তবৃত্তিকে অপেক্ষা করিয়া। ব্যাবহারিক জগতে আমাদের হৃদয়ে যখন কোনও ভাব উদ্গত হয়, যেমন—ক্রোধ ভয় শোক প্রভৃতি, তখন সেই ভাববিকৃতির অব্যবহিত পরেই শারীরিক বিকার (physical modification) পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ক্রুদ্ধ ব্যক্তির নেত্র আরক্ত হইয়া উঠে, নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়, হস্তের আস্ফালন দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল শারীরবিকৃতি

ক্রোধরূপ ভাববিকারেরই অনন্তরভাবি অব্যভিচারি কার্য্য।[১] সেইজন্য ইহারা ক্রোধের 'অনুভাব'রূপে কথিত হইয়া থাকে। সেইরূপ, মুখবর্ণের পাণ্ডুতা, রোমাঞ্চ, স্বেদশ্রুতি, পলায়নপ্রবৃত্তি প্রভৃতি শারীরবিকার লৌকিক ভয়াত্মক (fear) চিত্তবৃত্তির কার্য,—সুতরাং ইহারা লৌকিক ভীতির অনুভাব। সংস্কৃত রসমীমাংসকগণ অতি নিপুণভাবে বিভিন্ন চিত্তবিকারের সহচারী অনুভাবসমূহ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। শারদাতনয়ের 'ভাবপ্রকাশ'-গ্রন্থে আন্তর ভাববিকারের সহিত বাহ্য শরীরবিকৃতির নিগূঢ় সম্বন্ধ যেরূপ সূক্ষ্মভাবে আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে গ্রন্থকারের অতুলনীয় মনোবিশ্লেষণনৈপুণ্যে ও পর্যালোচনাশক্তির তীক্ষ্ণতায় সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। অতএব বুঝা গেল, সাহিত্যিক বিভাগ লৌকিক কারণের সমগোত্রীয়, সাহিত্যিক অনুভাব লৌকিক চিত্তবৃত্তিজন্য কার্যের সজাতীয়। কিন্তু অনুভাবের ক্ষেত্রে একটু বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। অনুভাব প্রকৃতপক্ষে লৌকিক চিত্তবৃত্তির কার্য হইয়াও সাহিত্যিক রসাত্মক চিত্তবৃত্তির কারণ। বিভাব যেমন সাহিত্যরসের কারণ, অনুভাবও তুল্যরূপে সাহিত্যরসের কারণ। ব্যাবহারিক জগতের 'কার্য' কিরূপে কাব্যজগতে 'কারণে'র পদবীতে উন্নীত হইতে পারে, ভরতাচার্যের রসসূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তাহা বিচার্য। এক্ষণে সাহিত্যিক রসের দুইটি অবশিষ্ট উপাদান 'স্থায়িভাব' ও 'সঞ্চারিভাব', ইহাদের স্বরূপ বিচার্য। পূর্বেই বলিয়াছি, 'স্থায়ী ও সঞ্চারিভাব, রসচর্বণার আন্তর উপাদান',—ইহারা সহৃদয়ের মনোজগতের সহিত সম্পৃক্ত।

মানুষ কখনও বাসনাহীন হইয়া এই জগতে জন্মলাভ করে না। কতকগুলি প্রবৃত্তি তাহার সহজাত—congenital। মহর্ষি গৌতম তাঁহার

---

১. বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'য় প্রত্যাখ্যানকুপিতা লুৎফুন্নিসার বর্ণনা লক্ষণীয়: "ললাটদেশে ধমনীসকল স্ফীত হইয়া রমণীয় রেখা দেখা দিল; জ্যোতির্ময় চক্ষুঃ রবিকরমুখরিত সমুদ্রবারিবৎ ঝলসিতে লাগিল; নাসারন্ধ্র কাঁপিতে লাগিল।"

ন্যায়সূত্রে বলিয়াছেন, "বীতরাগজন্মাদর্শনাৎ"। যতদিন রক্তমাংসগঠিত দেহপিঞ্জরের মধ্যে আত্মা বদ্ধ হইয়া থাকিবে, ততদিন পূর্বজন্মের বাসনা বা impression বা প্রবৃত্তিসমূহ তাহার সহিত নিত্য সমবেত হইয়াই থাকিবে। পুনর্জন্মবাদ স্বীকার না করিলেও যদি পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকগণের ন্যায় মানবের ক্রমবিবর্তনবাদ স্বীকার করাও যায়, তথাপি দীর্ঘকালের অভিব্যক্তিবশে যে সকল ভাবনা বা বাসনা মানব-মনে দৃঢ়মূলভাবে রোপিত হইয়া গিয়াছে, তাহারা বৃদ্ধ হইতে শিশুতে, এক যুগ হইতে অন্য যুগে, সঞ্চারিত হইবেই— তাহাদের বিলোপসাধন কোনও ক্রমেই মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে। তাহাদের কতকগুলি আমাদের চিত্তের উপরিস্তরে ভাসমান। তখন তাহাদের সত্তা জ্ঞানালোকের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে। আবার কতকগুলি হয়তো মানবমনের গভীরতম স্তরে অজ্ঞাতভাবেই আপন সত্তা বজায় রাখিয়া চলে— তাই বলিয়া তাহাদিগকে অপহ্নব করা যায় না। ইহা Freud-প্রমুখ মনোবৈজ্ঞানিকগণের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত। আমাদের প্রাচীন দার্শনিক আচার্যগণ বহুপূর্বেই এই সূক্ষ্ম তত্ত্বটি আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নবজাত শিশুর অপরিচিত পরিবেশ দর্শনে রোদনের মূলে আছে পূর্বজন্মসঞ্চিত ভয়াত্মক বাসনা (instinct of fear)। এইভাবে পূর্বজন্মের অনুভবজনিত সংস্কার-(impression)-রূপেই হউক, অথবা মানব-সমাজের দীর্ঘযুগপ্রবাহী ক্রমবিবর্তনের ফলেই হউক, ভয়, শোক, ক্রোধ, অনুরাগ, হাস, বিস্ময়, জুগুপ্সা, উৎসাহ, শঙ্কা, গ্লানি, অসূয়া, উদ্বেগ, নিশ্চয়—মানবের মনোজগৎ এইরূপ শত শত বিচিত্র বাসনার দ্বারা নিরন্তর শবলিত হইয়া আছে। এই চিত্তবৃত্তিগুলিকে সাহিত্যমীমাংসকগণ দুইটি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, একটির নাম 'স্থায়ী', অপরটি 'সঞ্চারী'। আলংকারিকগণের মতে স্থায়িভাবের সংখ্যা আটটি—রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা এবং বিস্ময়। স্থায়ী শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ permanent। অপরপক্ষে ব্যভিচারী বা সঞ্চারি-ভাবের (transient states of mind) সংখ্যা

ত্রয়স্ত্রিংশৎ।[১] স্থায়ী ও সঞ্চারিভাবের মধ্যে প্রকারগত পার্থক্য আপাতদৃষ্টিতে খুব গভীর নহে। রতি, ভয়, শোক প্রভৃতি ভাব যেমন বাসনা বা সংস্কার রূপে মানবমনের সহিত সম্বদ্ধ—নির্বেদ, গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া প্রভৃতি সঞ্চারিভাবও সংস্কাররূপেই আমাদের মনোজগতের উপাদানরূপে পুরুষপরম্পরায় সংক্রামিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং উভয়েই সমানরূপে সংস্কার। রতি বা ভয় যেমন instinctive বা সংস্কারপ্রসূত, শঙ্কা অসূয়া প্রভৃতিও তুল্যরূপে instinctive। তবে প্রভেদ কিসে? রতি প্রভৃতি আটটি ভাবই বা কেবল স্থায়ী বলিয়া পরিগণিত হইবে কেন? এইরূপ পরিগণনার পক্ষে যুক্তি কি? অভিনবগুপ্তাচার্য তাঁহার ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের ব্যাখ্যায় এই প্রশ্নের অতি সুন্দর সমাধান নির্দেশ করিয়াছেন। অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন: এই আটটি (বা নয়টি) মাত্র ভাবই কেবল স্থায়ী। কেননা, প্রাণী জাত হইবামাত্রই এই কয়টি সংবিদ্ বা বাসনার দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। সকলেই জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গেই দুঃখের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে, সুখাস্বাদবিষয়ে তৎপর হইয়া উঠে। ইহারই অপর সংজ্ঞা রিরংসা বা রতি। এইরূপে স্বোৎকর্যাভিমানও তাহার সহজাত বৃত্তি, তাহাঁর ফলে পরকে উপহাস করিবার প্রবৃত্তি তাহার আত্মোপার্জিত। আবার, ঈপ্সিতবস্তুর বিয়োগে তাহার চিত্ত স্বতঃই শোকাকুল হইয়া উঠে, এবং ঐ বিয়োগের যাহা হেতু, সেই বস্তুর প্রতি তাহার চিত্ত কোপপরবশ হয়, সুতরাং এই কোপও প্রাগ্‌ভবীয় বাসনার অঙ্কুররূপে তাহার চিত্তে রোপিত হইয়া থাকে। অপর পক্ষে, নিজের শক্তিহীনতা দর্শনে সে সহসা ভয়াকুল হয়। সুতরাং এই ভীতিও তাহার পূর্বজন্মসঞ্চিত বাসনারই লেশমাত্র। এইরূপে উৎসাহ, বিস্ময়, নির্বেদ প্রভৃতি অবশিষ্ট চিত্তবৃত্তিসমূহও তাহার সহজাত সংস্কার। এই সকল চিত্তবৃত্তিবিরহিত হইয়া কোনও প্রাণীই

১. যথা— নির্বেদ, গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া, মদ, শ্রম, আলস্য, দৈন্য, চিন্তা, মোহ, স্মৃতি, ধৃতি, ব্রীড়া, চপলতা, হর্ষ, আবেগ, জড়তা, গর্ব, বিষাদ, ঔৎসুক্য, নিদ্রা, অপস্মার, স্বপ্ন, বিরোধ, মাৎসর্য, অবহিত্থ, উগ্রতা, মতি, ব্যাধি, উন্মাদ, মরণ, ত্রাস এবং বিতর্ক।

জন্মগ্রহণ করে না।—"ন হ্যেতচ্চিত্তবৃত্তিবাসনাশূন্যঃ প্রাণী ভবতি"। হয়তো ব্যক্তিভেদে এই সকল বাসনার কোনও একটির ন্যূনতা বা আধিক্যমাত্র লক্ষিত হইয়া থাকে। কাহারও 'রাত'-বাসনা প্রবল, অন্য সমস্ত সংস্কার তাহার দ্বারা তিরস্কৃত হইয়া থাকে; কাহারও বা কোপ সমধিক দৃঢ়মূল। অপর পক্ষে, গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া প্রভৃতি চিত্তবৃত্তিসমূহ সমুচিত বিভাব বা কারণের অভাবে জন্মমধ্যে একবারও উৎপন্ন না হইতে পারে। যেমন, রসায়নসেবী যোগী তাঁহার দীর্ঘজীবনে একবারের জন্যও গ্লানি বা আলস্য বা শ্রম প্রভৃতি অনুভব করেন না। সমুচিত কারণের দ্বারা এই সকল চিত্তবৃত্তি যদিও-বা অভিব্যক্ত হয়, তথাপি সেই কারণ যখন অপগত হয়, তখন তজ্জনিত গ্লানি, শঙ্কা প্রভৃতি চিত্তবৃত্তিসমূহও যুগপৎ ক্ষীণ হইয়া যায়, চিত্তের মধ্যে তাহাদের কোনও চিহ্নই আর অবশিষ্ট থাকে না, অনভিব্যক্ত সংস্কাররূপেও নহে। কিন্তু রতি, উৎসাহ, জুগুপ্সা প্রভৃতি আটটি (বা নয়টি) চিত্তবৃত্তি; আলংকারিকগণের মতে যাহাদের সংজ্ঞা স্থায়িভাব, তাহাদের কখনও সম্পূর্ণ বিলোপসাধন করা যায় না। কোনও একটি বিশিষ্ট বিষয়ে 'উৎসাহ' নষ্ট হইলেও, অপর একটি বিষয়ে 'উৎসাহ' আমাদের চিত্তে অনুবৃত্ত হইয়াই থাকে। হংসপাদিকা যখন 'সকৃৎকৃতপ্রণয়' মহারাজ দুষ্যন্তের রতি বা প্রণয় হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, তখন শুদ্ধান্তের অন্য মহিষীগণও যে মহারাজের প্রণয় হইতে যুগপৎ বঞ্চিত হইয়াছিলেন, এইরূপ আশঙ্কা ভিত্তিহীন। সেইজন্য মহর্ষি ব্যাস বলিয়াছেন, 'ন হি চৈত্র একস্যাং স্ত্রিয়াং রক্ত ইত্যন্যাসু বিরক্ত ইতি'। কোনও একটি বিশিষ্ট রমণীর প্রতি চিত্তের অনুরাগের দ্বারা অন্য রমণীর প্রতি তাহার বিরাগ অনুমান করা যায় না। যদিও সাময়িকভাবে রতি প্রভৃতি চিত্তবৃত্তির কোনও একটি সম্পূর্ণ প্রক্ষীণ বা বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে বটে, তথাপি অনভিব্যক্ত সংস্কাররূপে উহারা চিত্তের অন্তস্তলে গুপ্তভাবে বিদ্যমান থাকে। অভিনবগুপ্তাচার্য এই স্থলে একটি উদাহরণের দ্বারা স্থায়ী ও ব্যভিচারী ভাবের পরস্পর সম্বন্ধ বুঝাইবার চেষ্টা

করিয়াছেন : "স্থায়িভাবসমূহ যেন রক্ত-পীত-নীল-হরিতাদিবর্ণের দ্বারা রঞ্জিত কতকগুলি সূত্র। এবং এই সূত্রের দ্বারাই যেন ক্ষণিক উদয়ব্যয়শালী বিচিত্র লীলাগর্ভ স্ফটিক-কাচাভ্রসকলের ন্যায় স্বচ্ছ ব্যভিচারিভাবসমূহ নিরন্তর গ্রথিত রহিয়াছে। রক্তনীলাদিসূত্রস্যূত স্ফটিকখণ্ডসমূহ যেমন সূত্রের বর্ণে রঞ্জিত হইয়া পদ্মরাগ, মরকত, মহানীল প্রভৃতি বিচিত্র রত্নের আকারে প্রতিভাত হয়, দুইটি স্ফটিকখণ্ডের মধ্যবর্তী অবকাশ যেমন সূত্রবর্ণরঞ্জিত স্ফটিকখণ্ডদ্বয়ের বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় প্রোদ্ভাসিত হইয়া উঠে, সেইরূপ ব্যাভিচারিভাবসমূহ রতি, ক্রোধ, হাস, শোক প্রভৃতি স্থায়িসূত্রের বৈচিত্র্যে রঞ্জিত হইয়া উঠে, এবং পূর্বাপর ব্যভিচারিভাবদ্বয়ের সেই প্রতিফলিত বৈচিত্র্যই আবার সূত্র-স্থানীয় স্থায়িভাবকে নব নব ভঙ্গিতে শবলিত করিয়া তাহাদের মধ্যে অপরূপ মনোহারিতা ও আস্বাদনীয়তার সঞ্চার করে। অতএব, দৃঢ়মূল স্থায়িভাব-সমূহই ব্যভিচারিভাবসমূহের একমাত্র ভিত্তি। ব্যভিচারিভাবসমূহের চিত্ত-ভূমির সহিত স্বতন্ত্র, স্থায়িনিরপেক্ষ কোনও যোগ বা সম্বন্ধ নাই। স্থায়ীর ব্যাপক সত্তা হইতেই তাহাদের উদ্ভব ; স্থায়ী হইতে প্রতিবিম্বিত বৈচিত্র্যই তাহাদের সহস্র বিচিত্র বিলাসের মূলে। তথাপি এই প্রতিফলিত বিলাস-বৈচিত্র্যের পুনঃপ্রতিফলনই আবার স্থায়ীকে রমণীয়তা দান করে। এইরূপে স্থায়িভাব ও ব্যভিচারিভাব পরস্পরোপকারী।[১] স্থায়িভাব সমুদ্রের মত ব্যাপক, উদয়ব্যয়হীন ব্যভিচারিভাবসমূহ সমুদ্রবক্ষের আবর্তের মত, বুদ্বুদের মত, কল্লোলের মত পরিবর্তনশীল, বৈচিত্র্যশতশালী। স্থায়ী হইতে ব্যভিচারি-ভাবের জন্মলাভ, স্থায়িভাবেই তাহার স্থিতি, স্থায়ীতেই তাহার অস্তময়।[২] ভরতাচার্য এই আটটি ভাবকেই কি জন্য স্থায়ী বলিয়াছেন, তাহার প্রতি তিনি স্বয়ং কোনও যুক্তি দেন নাই। অভিনবগুপ্তাচার্যই সর্বপ্রথম ভরতাচার্যের

---

১. অভিনবভারতী, প্রথম ভাগ, পৃ. ২৮৪। অভিনবগুপ্তের উপরিবাণত উদাহরণই পরবর্তী আলংকারিকগণের 'স্রক্‌সূত্রন্যায়ে'র মূলে।

২. দশরূপক ৪.৭ ও ধনিককৃত 'অবলোক' দ্রষ্টব্য।

এই আপাতদৃষ্টিতে যাদৃচ্ছিক বিভাগের দর্শন ও মনঃসমীক্ষণসম্মত ভিত্তি প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পরবর্তী কালের আলংকারিকগণ বোধ হয় 'অভিনবভারতী'র উপরি-উদ্ধৃত অংশটুকু লক্ষ্য করেন নাই। কেন না, এক হেমচন্দ্র তাঁহার 'কাব্যানুশাসন'-গ্রন্থেই[১] অভিনবগুপ্তের টীকার ঐ অংশটুকু হুবহু উদ্ধৃত করিয়াছেন, যদিও তিনি তাঁহার আকরের (source) নাম উল্লেখ করেন নাই। 'রসগঙ্গাধর'-কার পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ কেবলমাত্র ভরতাচার্যের দোহাই দিয়াই নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছেন, কিছুমাত্র মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি-প্রদর্শনের চেষ্টাই করেন নাই।[২] যেহেতু মুনি রতি, হাস, ক্রোধ, শোক, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় এবং নির্বেদ এই নয়টি মাত্র চিত্তবৃত্তিকে স্থায়িভাবরূপে পরিগণনা করিয়াছেন, অতএব তাঁহার নির্দেশ লঙ্ঘন করিবার সামর্থ্য তাঁহাদের নাই। ঐরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা মুনিবচনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; এবং স্থায়িভাবসমূহই যেহেতু ভরতাচার্যের মতে রসপদবীতে উত্তীর্ণ হইতে পারে, সেইহেতু সাহিত্যিক রসের সংখ্যাও যথাক্রমে নয়টি— শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত এবং শান্ত। অনেকে বাৎসল্য, ভক্তি প্রভৃতি রসান্তর স্বীকার করিয়াছেন বটে। কিন্তু ভরতাচার্যের মতে উহা অসম্ভব। পুত্রের প্রতি মাতাপিতার যে রতি বা স্নেহ, উহা কখনও স্থায়িভাবরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। দেবাদিবিষয়ক রতি, যাহা

---

১. নির্ণয়সাগর সংস্করণ, পৃ. ৮৩-৮৪ দ্রষ্টব্য।

২. এক স্থলে তিনি ভরতাচার্যকৃত বিভাগের সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ সমর্থন খুব সন্তোষজনক হইয়া উঠে নাই: "তত্র আপ্রবন্ধং স্থিরত্বাদমীষাং ভাবানাং স্থায়িত্বম্। ন চ চিত্তবৃত্তিরূপাণামেষামাশুবিনাশিত্বেন স্থিরত্বং দুর্লভম্। বাসনারূপতয়া স্থিরত্বং তু ব্যভিচারিষু অতিপ্রসক্তম্—ইতি বাচ্যম্। বাসনারূপাণাম্ অমীষাং মুহুর্মুহুরভিব্যক্তেরেব স্থিরপদার্থত্বাৎ। ব্যভিচারিণাং তু নৈব, তদভিব্যক্তের্বিদ্যুদুদ্দ্যোতপ্রায়ত্বাৎ।"—রসগঙ্গাধর, পৃ. ৩৭ (নির্ণয়সাগর সংস্করণ)।

হইতে ভক্তির উদ্ভব, তাহাও স্থায়িভাব নহে। উহারা ব্যভিচারিভাব মাত্র ;[১] এবং ব্যভিচারিভাব কখনও স্থায়িভাবের মত পূর্ণ, স্বতন্ত্র আনন্দময় অভিব্যক্তি লাভ করিতে পারে না। স্থায়িভাবেরই কেবলমাত্র সেই শক্তি ও মহিমা আছে। সেইজন্যই ভরতাচার্য স্পষ্টই বলিয়াছেন, "স্থায়িভাবান্ রসত্ব-মুপনেষ্যামঃ।[২] মানবের মনোজগতে স্থায়িভাবের আসন সর্বাগ্রে, স্থায়িভাবটি

---

১. রসগঙ্গাধর পৃ. ৫৬, ৯৪। Watson তাঁহার *Behaviorism*-গ্রন্থে যৌনরতি, পুত্রাদিবিষয়ক রতি প্রভৃতি এবংজাতীয় সমস্ত চিত্তবৃত্তিকেই একশ্রেণীতে ফেলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন : "Love responses include "those popularly called 'affectionate', 'good natured', 'kindly',...as well as responses we see in adults between the sexes. *They all have a common origin.*"—C. K. Ogden প্রণীত *The A B C of Psychology* গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ১৪০ (London : Kegan Paul. Trench Trübner & Co, Ltd.. 1941)।

২. ব্যভিচারিভাবসমূহ যে রস বা emotion রূপে পরিণত হইতে পারে না,—ইহা পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণও স্পষ্টভাবেই স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারাও চিত্তবৃত্তিগুলিকে স্থায়ী ও ব্যভিচারী—এই দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকেন। অধ্যাপক Ogden, belief ও doubt—প্রাচ্য সাহিত্যমীমাংসকগণের মতে যে দুইটি চিত্তবৃত্তিকে যথাক্রমে 'মতি' ও 'বিতর্ক' এই দুইটি ব্যভিচারিভাবের সহিত তুলনা করা যায়—তাহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন : "It remains to discuss two other topics *which less evidently come under the heading of emotional phenomena.* One of these includes belief, doubt, perjudice, and so forth ; the other deliberation, resolve, and the fluctuations of the will... But when we analyse the states of consciousness known by these names we find that the distinctive character of a crisis of belief or doubt is a feeling of the same general kind as joy, for example, or fear, though unique in flavour. Expectation, bare assent, and familiarity are examples of such belief feelings. *They are generally less intense than emotions,* although pathological forms of doubt and ecstatic belief are not infrequent."—*The A B C of Psychology*, পৃ. ২০৫-৬ : 'সংশয়' বা 'নিশ্চয়' কখনও কোনও ব্যক্তির মুখ্য চিত্তবৃত্তি হইতে পারে না। যদি হয়,—তাহার নিজের অস্তিত্ব বিষয়েই সংশয় উপস্থিত হইবে, যাহার পরিণাম মানসিক অপমৃত্যু—'সংশয়াত্মা

যেন বীণার মূল স্বর, ব্যভিচারিভাবসমূহ তাহারই যেন অনুরণন—Harmonics শাস্ত্রে যাহাকে বলা হয় undertone। ভরতাচার্য তাঁহার নাট্যশাস্ত্রের (৭. ৮) এক স্থলে বলিয়াছেন, "মানবের মধ্যে নরপতি যেমন শ্রেষ্ঠ, শিষ্য-সংসদে গুরু যেমন বরেণ্য, সেইরূপ ভাবসমাজে স্থায়িভাব সর্বাপেক্ষা মহান্।" সেই স্থায়িভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তির জন্যই সাহিত্যের যতকিছু সামগ্রী,—বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারিভাব, তাহাদের সমাবেশবিষয়ে কবি তৎপর হইয়া থাকেন। আমরা রসচর্বণার উপাদানসমূহের স্বরূপ বর্ণনা করিলাম।

বিনষ্টি'। Ogden বলিয়াছেন—"...in doubting manias everything can be doubted. The patient may sometimes even doubt whether he exists."—ঐ, পৃ ২০৭। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, সংশয় বা নিশ্চয় বা অন্যান্য চিত্তবৃত্তি যাহাদের ব্যভিচারিভাবরূপে পরিগণনা করা হয়, তাহারা চিত্তের মধ্যে কোনও স্থায়ী সংস্কার বা impression রাখিয়া যাইতে পারে না; "It may be that the intensity of the belief-feeling is no criterion of the permanence of the disposition which it leaves behind. Many people who experience the most intense beliefs are also the most changeable and instable in their conviction."—Belief (মতি) doubt (বিতর্ক) প্রভৃতি ব্যভিচারিভাবগুলি যে মূলত কতকগুলি স্থায়িভাব—যেমন রতি, শোক, ক্রোধ প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি হইতেই উদ্ভূত হয়, এবং তাহারা পরস্পর যে পরস্পরের মধ্যে নবীনতা ও বৈচিত্র্য আধান করিয়া থাকে, ইহাও তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন: "As a rule,...the belief or doubt feelings are very subtly interwoven with the other emotions. We rarely believe strongly unless some emotion—it may be joy or fear, pride or humility—is reinforcing the belief. And doubt, more evidently, perhaps, is commonly dependent upon a prior clash of interests and a resultant emotion...But if *these intellectual feelings spring from other emotions they also give rise to them*, since they modify so fundamentally the course of our responses."—ঐ পৃ ২০৭। স্থায়িভাব ও সঞ্চারিভাবের স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যমীমাংসকগণের মতবাদের সহিত আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক দার্শনিকগণের এতগুলি বিষয়ে এইরূপ ঘনিষ্ঠ সংবাদ সত্যই বিস্ময়কর। উদ্ধৃত ইংরেজী সন্দর্ভটির সহিত অভিনবগুপ্তাচার্যের স্থায়ী ও ব্যভিচারিভাবের পার্থক্যপ্রদর্শক যুক্তিসমূহ তুলনীয়।

২. "বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ"

ভরত : নাট্যশাস্ত্র

ভরতের নাট্যশাস্ত্রের অনেক প্রাচীন ব্যাখ্যাতা ছিলেন।[১] আজ শুধু অভিনবগুপ্তাচার্যের 'অভিনবভারতী'ই বর্তমান। 'বিভাবানুভাবব্যভিচারি-সংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ'—এইটি ভরতাচার্যের রসসূত্র। বিভিন্ন ভাষ্যকার বিভিন্নভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে চারিজনের মত সাহিত্যমীমাংসকগণ কর্তৃক বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। লোল্লট, শঙ্কুক, ভট্টনায়ক এবং অভিনবগুপ্ত—এই চারিজনই ভারতীয় রসসূত্রের প্রধান ভাষ্যকার। আমরা যথাক্রমে তাঁহাদেরই মত আলোচনা করিব। মম্মটাচার্যও তাঁহার 'কাব্যপ্রকাশে' এই ক্রমই অনুসরণ করিয়াছেন।

ভারতীয় রসসূত্রের বিভিন্ন ভাষ্য পর্যালোচনার পূর্বে আমাদের কয়েকটি সাধারণ বিষয় লক্ষ্য করা উচিত। প্রথমত, উপরি-উদ্ধৃত রসসূত্রে কেবলমাত্র বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারিভাব—যথাক্রমে এই তিনটি পদার্থেরই উল্লেখ আছে ; স্থায়িভাবের কোনও উল্লেখ মহর্ষি করেন নাই। দ্বিতীয়ত, 'সংযোগ' শব্দটির অর্থ মহর্ষির কিরূপ অভিপ্রেত ছিল তাহা অতিশয় সন্দিগ্ধ। তৃতীয়ত, 'নিষ্পত্তি'-শব্দের অর্থও স্পষ্ট করিয়া মহর্ষি নির্দেশ করেন নাই। ভরতাচার্যের রসসূত্রের ব্যাখ্যানভেদের এই তিনটিই মুখ্য কারণ। ভট্টলোল্লট, শঙ্কুক, ভট্টনায়ক, অভিনবগুপ্ত, প্রত্যেকেই বিভিন্ন উপায়ে সন্দিগ্ধ স্থলের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং মতভেদ অবশ্যম্ভাবী। আমরা প্রথমত ভট্টলোল্লটের মতেরই পর্যালোচনা করিব।

৩. ভট্টলোল্লট : উৎপত্তিবাদ

ভট্টলোল্লট বলেন : 'কাব্য' বা 'নাট্য' হইতে যে 'রস'বোধ হয়, উহা পাঠক বা প্রেক্ষক সমাজের পক্ষে গৌণ। পাঠক অথবা প্রেক্ষক, সাধারণভাবে

১. "ব্যাখ্যাতারো ভারতীয়ে লোল্লটোদ্ভটশঙ্কুকাঃ ।
ভট্টাভিনবগুপ্তশ্চ শ্রীমান্ কীর্তিধরোঽপরঃ ॥"—সঙ্গীতরত্নাকর

কোনও সহৃদয়ের চিত্তেই মুখ্যভাবে 'রসে'র উৎপত্তি হয় না। তবে রসের মুখ্য বা প্রকৃত আশ্রয় কে? কবি, সহৃদয়, অনুকর্তা নট, অথবা অনুকার্য দুষ্মন্ত শকুন্তলা প্রভৃতি নায়কনায়িকা? ঐতিহাসিক (অথবা কাল্পনিক বা পৌরাণিক যাহাই বলা হউক না কেন) দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার চরিত্র অবলম্বন করিয়া যেখানে নাট্যের অভিনয় হইতেছে, সেখানে দুষ্মন্ত শকুন্তলা প্রভৃতি পাত্র-পাত্রীগণ, ইংরেজীতে যাহাদের ড্রামাটিস্ পার্সনি (*dramatis personæ*) বলা হইয়া থাকে, তাঁহারা অনুকার্য, এবং যে সকল অভিনেতা তাঁহাদের 'রূপ' গ্রহণ করেন, ঐ সকল চরিত্রসমূহের 'অনুকরণ' করিয়া প্রেক্ষকগোষ্ঠীর মনোরঞ্জন করেন, তাঁহারা 'অনুকর্তা'। কেননা, নাট্য লোকবৃত্তেরই অনুকরণ মাত্র। ভরতাচার্য নিজেই বলিয়াছেন: 'লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যমেতদ্ ভবিষ্যতি।' সুতরাং দুষ্মন্ত, শকুন্তলা প্রভৃতি পাত্রপাত্রী নাট্যে 'অনুকার্য,' এবং কুশীলবগণ সেই সকল ঐতিহাসিক অথবা পৌরাণিক চরিত্রেরই 'অনুকর্তা'। এক্ষণে, কবি, সহৃদয়, অনুকার্য এবং অনুকর্তা, এই চারিজনের মধ্যে রসের মুখ্য আশ্রয় কে? ভট্টলোল্লট বলেন: 'অনুকার্য'ই প্রকৃতপক্ষে রসের আশ্রয়, তিনিই যথার্থ রস অনুভব করিয়া থাকেন। শকুন্তলা-বিষয়ক যে শৃঙ্গাররস উহা মুখ্যত ঐতিহাসিক (অথবা পৌরাণিক) দুষ্মন্তের পক্ষেই সম্ভবপর। এবং ঐ 'রস' বিভাব অনুভাব এবং সঞ্চারিভাবের পরস্পর 'সংযোগে' সেই ঐতিহাসিক দুষ্মন্তের হৃদয়ে 'উৎপন্ন' হইয়াছিল। লোল্লটাচার্যের মতে—রসসূত্রের অন্তর্গত 'নিষ্পত্তি' পদটির অর্থ উৎপত্তি অথবা প্রোডাক্শন। 'উৎপত্তি' বলিতে আমরা 'অভূত-প্রাদুর্ভাব' বুঝিয়া থাকি। 'যাহা ছিল না তাহা হওয়া'—ইহার নাম 'অভূত-প্রাদুর্ভাব', ইহারই নাম উৎপত্তি। মৃত্তিকা হইতে ঘটের 'উৎপত্তি' হয়, কেন-না, ঘট পূর্বে ছিল না, ইহা একটি সম্পূর্ণ নূতন পদার্থ। মৃত্তিকা ইহার উৎপাদক কারণ। সেইরূপ 'রস ও একটি অপূর্ব বস্তু। ঐতিহাসিক দুষ্মন্তের চিত্তে যে রসের প্রাদুর্ভাব উহা 'অভূত-প্রাদুর্ভাব'। পূর্বে উহার অস্তিত্ব ছিল না, সেই জন্য উহা অপূর্ব। অতএব 'রসনিষ্পত্তি' শব্দের অর্থ

'রসোৎপত্তি'। সেই জন্য ভট্টলোল্লট সাহিত্য-মীমাংসকগণের মধ্যে 'উৎপত্তি-বাদী' বলিয়া পরিচিত।

ভাল কথা, ঐতিহাসিক দুষ্মন্তের হৃদয়ে 'রস' যে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া গেল। কিন্তু এই 'উৎপত্তি'র প্রতি কারণ কোন্‌টি? "বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারিভাবের 'সংযোগ'বশত রসের উৎপত্তি হয়"—ইহাই তো ভরতাচার্যের রসসূত্রের আপাতদৃষ্টিতে সরল অর্থ। কিন্তু 'সংযোগ' শব্দটির অর্থ কি? রসোৎপত্তির প্রতি উহাদের পরস্পর উপযোগিতাই বা কতটুকু? উত্তরে লোল্লটাচার্য বলেন: 'সংযোগ'-শব্দের সাধারণ অর্থ 'সম্বন্ধ'। কিন্তু সম্বন্ধ তো নানাপ্রকার হইতে পারে। কার্যকারণভাব হইতে পারে, জ্ঞাপ্য-জ্ঞাপকভাব হইতে পারে, উৎপাদ্য-উৎপাদকভাব হইতে পারে, আশ্রয়াশ্রয়িভাব হইতে পারে। আরও কত প্রকার যে হইতে পারে, তাহার কোনও ইয়ত্তা নাই। তবে, রসসূত্রে সম্বন্ধবাচক 'সংযোগ'-শব্দের বিশিষ্ট অর্থ কি? কোন্ বিশেষ সম্বন্ধটি ইহার দ্বারা বোধিত হইতেছে, কাহার সহিতই বা এই সম্বন্ধ? ভট্টলোল্লট বলেন: রসসূত্রে 'সংযোগ'-শব্দটি তিনটি বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধকে বুঝাইতেছে। কেননা, বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারি-ভাবের সহিত রসাত্মক চিত্তবৃত্তির সম্বন্ধ তিন প্রকার। বিভাবের সহিত রসের উৎপাদ্য-উৎপাদকভাব সম্বন্ধ, অনুভাবের সহিত গম্য-গম্যকভাব সম্বন্ধ, এবং ব্যভিচারিভাবের সহিত রসের সম্বন্ধ পোষ্য-পোষকভাব। একই 'সংযোগ'পদ বিভিন্ন পদের সহিত অন্বয়বশে তিনটি বিভিন্ন সম্বন্ধবিশেষের বোধক।[1] লোল্লটাচার্যের মতে রতি প্রভৃতি আটটি স্থায়িভাবই 'রস'— স্থায়িভাব ও রসাত্মকচিত্তবৃত্তির মধ্যে কোনও স্বরূপগত বৈষম্য নাই। উহারা পরস্পর অভিন্ন। ঐতিহাসিক মহারাজ দুষ্মন্তের হৃদয়ে শকুন্তলা-বিষয়ক রতিভাবের

---

১. এতদ্বিবৃণ্বতে ভট্টলোলটপ্রভৃতয়ঃ—"স্থায়িনাং বিভাবেন উৎপাদ্যোৎপাদকভাবরূপাদ্, অনুভাবেন গম্যগমকভাবরূপাদ্, ব্যভিচারিণা পোষ্যপোষকভাবরূপাৎ সম্বন্ধাৎ রসস্য নিষ্পত্তিরুৎপত্তিঃ অভিব্যক্তিঃ পুষ্টিশ্চেত্যর্থঃ।—গোবিন্দঠক্কুরকৃত কাব্য-প্রদীপ, পৃ. ৬৩ (নির্ণয়সাগর সংস্করণ)।

প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল—যাহাকে সাহিত্য-মীমাংসায় পারিভাষিক 'শৃঙ্গার'-শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হয়। উহার পূর্বে কোনও অস্তিত্ব ছিল না। শকুন্তলাই ঐ রতিরূপ স্থায়িভাবের আলম্বনবিভাব, উহার 'উৎপত্তি'র প্রতি কারণ। অতএব, 'রস' অথবা স্থায়িভাবের সহিত বিভাবের সম্বন্ধ উৎপাদ্য-উৎপাদকভাব। কিন্তু মহারাজ দুষ্যন্তের হৃদয়ে শৃঙ্গাররসের 'উৎপত্তি' হইয়াছে, ইহা লোকে বুঝিবে কিসে? পরচিত্ত তো সর্বদাই পরোক্ষ। একজনের আন্তর চিন্তাধারা আর একজনের নিকট অজ্ঞাত—ইহা তো সর্ববাদিসম্মত সত্য। তবুও বাহ্য শারীরচেষ্টাসমূহ দুইটি অপরিচিত মনোজগতের মধ্যে পরিচয়ের সেতু স্থাপনা করে। নতুবা, লৌকিক সমস্ত ব্যবহার অচল হইয়া পড়িত। আমরা ভ্রূভঙ্গ, আকার, ইঙ্গিত, চেষ্টা, ভাষণ প্রভৃতির দ্বারা পরচিত্তের অন্তর্গূঢ় চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইতে পারি। মনোজগৎ পরোক্ষ বটে, কিন্তু আকার ইঙ্গিত প্রভৃতি সমস্তই বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ধূম যেমন অদৃশ্য বহ্নির জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়, সেইরূপ শারীরবিকৃতিসমূহও, যাহাদিগকে সাহিত্য-মীমাংসাশাস্ত্রে পারিভাষিক 'অনুভাব' সংজ্ঞার দ্বারা অভিহিত করা হইয়া থাকে, পরোক্ষ আন্তর বৃত্তিসমূহের গমক। সুতরাং 'রস' ও 'অনুভাবে'র মধ্যে গম্য-গমকভাবসম্বন্ধ—ধূম ও বহ্নির মত। 'রস' গম্য বা অনুমেয়; আকার, ইঙ্গিত, চেষ্টা প্রভৃতি 'অনুভাব' গমক বা অনুমাপক।[১] এক্ষণে ব্যভিচারিভাবের রসোদ্বোধের প্রতি উপযোগিতা কতটুকু?

১. এখানে সাধারণ দর্শক বা সামাজিকের পক্ষ হইতেই 'অনুভাব'সমূহের নায়কগত রসানুভূতির প্রতি 'গম্য-গমকভাব' প্রতিপাদন করা হইয়াছে। টীকাকারগণও লোল্লটাচার্যের মতের এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু নায়কগত রসানুভূতির পূর্ণতাও অনেকটা তাঁহার স্বকীয় অনুভাবের উপরই নির্ভর করে। অনুভাবসমূহ শুধু যে সাধারণের নিকটেই নায়কগত রসাত্মক চিত্তবৃত্তির গমক, তাহা নহে,—নায়কের স্বকীয় রসও অনুভাবসমূহের দ্বারাই তাঁহার নিকট উদ্বোধিত হইয়া থাকে। এমন কি, অনেক আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদ্ (যেমন James, Lange প্রভৃতি) শারীরবিকৃতি বা

সত্য বটে, 'বিভাব' রস অথবা স্থায়িভাবের উৎপত্তির প্রতি কারণ (efficient cause), এবং 'অনুভাব'সমূহ সেই উৎপন্ন স্থায়িভাবের গমক।

অনুভাবসমূহকে রসানুভূতি হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। রস বা emotion কেবলমাত্র জায়মান অনুভাবসমূহের সমষ্টি মাত্র,—কোনও পৃথক পদার্থ নহে। শারীরবিকৃতি হইতে আমাদের রসবোধের কোনও পৃথক সত্তা নাই। আমার 'ক্রোধ' বা 'রৌদ্ররস' আর কিছুই নহে,—উহা কেবল আমার নয়নের রক্তিমা, ভ্রূভঙ্গ, করাস্ফালন, পরুষভাষণ প্রভৃতি শারীরবিকার বা অনুভাবেরই সমষ্টি বা aggregate মাত্র। এই দিক দিয়া বিচার করিলে অনুকার্যগত মুখ্য রসানুভূতির প্রতি অনুভাব-সমূহও বিভাবের মতই উৎপাদক কারণ,—যদিও দর্শকের দৃষ্টিতে উহারা অনুকার্যগত রসের বা স্থায়িভাবের 'অনুমাপক' হইতে পারে বটে।

দ্রষ্টব্য : "James says, 'Bodily changes follow directly the perception of the exciting fact, and our feeling of the same changes as they occur *is* the emotion.'...Certainly, in my opinion, no case can be made out against its main contention, namely, that the experiences, feelings or states of mind which we call *'emotions' are caused by, and are absolutely dependent upon, bodily changes.* If there were no bodily changes, if consequently the field of consciousness were to contain no sensations of endosomatic origin, there could be no emotion.

"Nor do I see any great weight in the criticisms which have been brought against the use of the word *is* in the passage cited above. It has been pointed out that to say "our feeling of the [bodily] changes as they occur (i. e. the sum total of the endosomatic sensations) *is* the emotion", is to assert an identity between the emotion and the sensation, and that although there may be *a causal connexion between the sensation and the state of mind we call emotion*, this is not logically equivalent to identity. But, as against this. I would contend that the connexion between the endosomatic sensations, and the affective component of the total mental state (i. e. the 'emotion') is precisely the same as that between any other sensation and the change in consciousness produced thereby. So far as *mind* is concerned, sensations emanating from my own body are just external, just as much 'given *ab extra*' as those emanating from what I describe as 'objects' outside my body, and should be treated in the same way as the latter. If we say that the change in consciousness produced by an ordinary visual sensation *is* 'perception,' I do not see that we have any right to deny that the change in consciousness

কিন্তু, স্থায়িভাবের উৎপত্তিকেই কেবলমাত্র রস বলা যায় না,—উহা যতক্ষণ না অন্যান্য সহকারিগণের দ্বারা উপচিত হয়, ততক্ষণ পূর্ণ আস্বাদময় পরিণতি লাভ করিতে পারে না। 'বিভাব' রসবীজের উৎপত্তির প্রতি কারণ হইতে পারে বটে, এবং অনুভাব উহার সত্তা সাধারণ্যে ঘোষণা করিয়া দিতে পারে বটে, তথাপি ঐ বীজের মধ্যে যে পূর্ণ ফলপুষ্পবিশোভিত বনস্পতির সম্ভাবনা নিহিত আছে, তাহা তখনই সফলতা লাভ করিতে পারে, যখন 'ব্যভিচারি-ভাব'রূপ সহকারিকারণের দ্বারা ঐ রসাঙ্কুরের পরিপুষ্টি সাধিত হয়। শঙ্কা, অসূয়া, বিতর্ক, নির্বেদ, গ্লানি প্রভৃতি ব্যভিচারিভাব শৃঙ্গাররসকে পরিপূর্ণ আস্বাদ্যতা দান করে। শকুন্তলার প্রতি মহারাজ দুষ্মন্তের রতিভাব কত ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া আপন পূর্ণ পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। কণ্বের তপোবনে রূপমুগ্ধ মহারাজ দুষ্মন্তের হৃদয়ে শকুন্তলার জন্মবিষয়ে 'বিতর্ক', রাজসভায় উপনীতা শকুন্তলাকে দেখিয়া দুর্বাসার শাপপ্রভাবে দুষ্মন্তের আকস্মিক 'মোহভাব', অতঃপর শকুন্তলার অন্তর্ধানের পর ক্রমশ মহারাজের পূর্ববৃত্তান্ত 'স্মরণ', এবং তজ্জনিত আত্মধিক্কার বা 'নির্বেদ'—এইরূপ কত বিচিত্র ব্যভিচারিভাবের সমাবেশের দ্বারা মহারাজ দুষ্মন্তের শকুন্তলাবিষয়ক 'রতি' শবলিত হইয়া উঠিয়াছে, পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, 'বিষমশিলাসঙ্কট-

---

produced by a different kind of sensation (i. e. a visual or other endosomatic sensation) *is* 'emotion'..."—W. Whately Smith : *The Measurement of Emotion*, পৃ. ১৮-:৯. (London, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., Ltd. 1922)

লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, উদ্ধৃত মন্তব্য 'লৌকিক' রসের সম্বন্ধেই প্রধানভাবে প্রযোজ্য। ভট্টলোল্লটের মতেও যাহা 'মুখ্য রস', অর্থাৎ যাহা অনুকার্য দুষ্মন্তপ্রমুখনায়কনিষ্ঠ স্থায়িভাব, তাহাও 'লৌকিক' রসমাত্র,—সাহিত্যিক 'রস' নহে। সাহিত্যিক রস 'অলৌকিক',—কেন-না, সে স্থলে দেশ, কাল, অবস্থা, অহংতা, মমতা প্রভৃতি আত্মার বা বিজ্ঞানধারার যত কিছু কাল্পনিক ও অবাস্তব পরিচ্ছেদ বা limitation, সে সমস্তই তখনকার মত অবলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু লৌকিক রসানুভূতির ক্ষেত্রে আমাদের বিজ্ঞানসন্ততির এই সকল পরিচ্ছেদই বজায় থাকে। পরে এ সম্বন্ধে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইবে।

স্খলিতবেগ' নদীপ্রবাহের মত গতিশীল হইয়া উঠিয়াছে, কোথাও মন্দ হইয়া যায় নাই। এখন বুঝা গেল, বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারিভাবের রসোৎপত্তির প্রতি উপযোগিতা কতটুকু। শুদ্ধ বিভাব, শুদ্ধ অনুভাব, অথবা শুদ্ধ সঞ্চারিভাবের দ্বারা প্রকৃত রসবোধ সম্ভবপর নহে। ইহাদের পরস্পর সংহতির দ্বারাই চরম পরিপূর্ণতা ও সুনিশ্চিত বৈশিষ্ট্য সম্ভবপর।[১]

কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে,—নাট্যের অভিনয়দর্শনাবসরে সত্যসত্যই কি প্রেক্ষকসমাজের হৃদয়ে অনুকার্য দুষ্যন্তাদিনায়কগত রসেরই কেবলমাত্র বোধ জন্মে? তাহাদের কি এইরূপ জ্ঞান হয় যে, "ঐতিহাসিক মহারাজ দুষ্যন্ত শকুন্তলার প্রতি রতিমান্"? অনুভব বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে ইহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হইবে। সত্য বটে, ঐতিহাসিক দুষ্যন্তেই শকুন্তলা-বিষয়ক রতিভাব বাস্তব। কিন্তু ঐরূপ জ্ঞান তো সামাজিকগণের চিত্তে উদ্ভূত হয় না? সামাজিকগণ দুষ্যন্ত-শকুন্তলাদি নায়কনায়িকার অনুকরণশীল নট বা অভিনেতাদিগকেই ঐতিহাসিক দুষ্যন্ত শকুন্তলা প্রভৃতি রূপে মনে করিয়া থাকেন। নাট্যদর্শনের সময় অভিনয়নিপুণ দুষ্যন্তরূপী নটকে দেখিয়া— 'এই ব্যক্তি দুষ্যন্ত নহেন, কিন্তু নট মাত্র'—সামাজিকগণের এইরূপ নিঃসন্দিগ্ধ ভেদপ্রতীতি হয় না। 'এই ব্যক্তিই মহারাজ দুষ্যন্ত, ইনিই শকুন্তলার প্রতি রতিমান্'—নটকে দেখিয়া এইরূপ অভেদবোধই বরং সামাজিকগণের পক্ষে অধিকতর সমীচীন। কিন্তু, সত্য সত্যই তো অনুকর্তা নট, এবং অনুকার্য ঐতিহাসিক দুষ্যন্ত প্রভৃতি পাত্রপাত্রী অভিন্ন নহে, সত্য সত্যই তো নটের চিত্তে শকুন্তলাবিষয়ক শৃঙ্গাররস বাস্তব নহে। এমন কি, নট যতই অভিনয়নিপুণ হউক না কেন, প্রকৃতপক্ষে কোনও 'রস' অনুভব করিয়া থাকে কি না, তাহাই সন্দেহের বিষয়। সুতরাং প্রেক্ষকগণের এইরূপ প্রতীতি কিরূপে সমর্থন করা যায়? ভট্টলোল্লট ইহার

১. "এবং চ বিভাবৈরীষদ্ অভিব্যক্তিঃ, অনুভাবৈঃ স্ফুটা, ব্যভিচারিভিঃ স্ফুটতরা—ইতি সমুদায়-জন্যাভিব্যক্তিরেব রসত্বাপাদিকেতি।"—বৈদ্যনাথ-বিরচিত কাব্যপ্রদীপটীকা, পৃ. ৬২।

উত্তরে বলেন : সত্য বটে, অনুকর্তা নট অনুকার্য দুষ্যন্তাদি পাত্রপাত্রী হইতে ভিন্ন, এবং সে কখনও অনুকার্যনিষ্ঠ মুখ্যরসের বাস্তব আশ্রয় হইতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া সামাজিকগণের যে নট ও অনুকার্য নায়কের মধ্যে অভেদবোধ হইয়া থাকে, এবং তাঁহারা যে নটকেই বাস্তবিকভাবে মুখ্যরসের আধার বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, ইহাও যে একেবারেই যুক্তিবর্জিত ও আকস্মিক, তাহাও নহে। নটকে তাঁহারা অনুকার্য নায়কের সহিত অভিন্ন বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন, এবং এই অভেদবোধ 'আরোপমূলক'। আমরা সুন্দর শিশুমুখকে চন্দ্রের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করি—মুখে চন্দ্রত্বের 'আরোপ' করিয়া থাকি। ইহার মূলে আছে মুখ ও চন্দ্রের মধ্যে সৌন্দর্য বিষয়ে সাধর্ম্য। নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রেও দুষ্যন্ত ও নটের মধ্যে যে অভেদবোধ, তাহারও মূলে আছে উভয়ের সাধর্ম্য। এই সাধর্ম্যই নটে 'দুষ্যন্ত'-রূপ ধর্মের আরোপের (সুপার্-ইম্পোজিশন) মূলে। কি সেই সাধর্ম্য? উত্তরে ভট্টলোল্লট বলেন : ঐতিহাসিক দুষ্যন্ত ব্যক্তির অনুভাব, বেশভূষা প্রভৃতির সহিত অভিনয়কোবিদ নটের সেই সেই বিষয়ে সাম্য। ঐতিহাসিক দুষ্যন্তের শকুন্তলাসন্দর্শনে যেমন যেমন শারীরচেষ্টাসমূহ দৃষ্ট হইয়াছিল, মহারাজ দুষ্যন্ত যেমনভাবে রাজোচিত বসনাভরণে সজ্জিত হইয়া থাকিতেন, শকুন্তলা-বিরহে মহারাজ দুষ্যন্তের যেরূপ বিরহদশা দেখা দিয়াছিল, অভিনয়নৈপুণ্যবশে এই সমস্ত অবস্থারই নিছক প্রতিফলনের দ্বারা নটকে দুষ্যন্তাভিন্ন বলিয়া প্রতীতি জন্মে। এবং ঐতিহাসিক দুষ্যন্তে যে রতিভাব মুখ্যভাবে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহাও সহৃদয় সামাজিকগণ কর্তৃক দুষ্যন্তরূপী নটব্যক্তিতে 'আরোপিত' হইয়া থাকে। সেই জন্য ভট্টলোল্লট বলিয়াছেন, "তদ্রূপতানুসন্ধান" বা নট কর্তৃক অনুকার্য নায়কের রূপের 'অনুসন্ধান' বা 'অনুকৃতি'ই নটে ঐতিহাসিক নায়কনিষ্ঠ স্থায়িভাবের আরোপের মূলে। বস্তুত নটে কোনও রসের বাস্তব সত্তা নাই, উহা কেবল উপচরিত মাত্র, অতএব অমুখ্য। এই আরোপের ফলেই "ইনি দুষ্যন্ত, ইনি শকুন্তলা বিষয়ক রতিমান্", সহৃদয়ের চিত্তে এইরূপ

প্রতীতির উদ্ভব হইয়া থাকে। নটকে 'দুষ্যন্ত' বলিয়া এই যে জ্ঞান, ইহা 'অনুমান' নহে, ইহা সাক্ষাৎকার বা পারসেপ্শন। কিন্তু ইহা লৌকিক সাক্ষাৎকার নহে, ইহা অলৌকিক (ট্রান্সেন্ডেন্টাল)। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ বা সংযোগবশে যে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাকেই সাক্ষাৎকার বা প্রত্যক্ষজ্ঞান (পারসেপ্শন, ইমিডিয়েট নলেজ) বলা হয়। এই প্রত্যক্ষের আবার দুইটি বিভাগ—লৌকিক এবং অলৌকিক। লৌকিক প্রত্যক্ষ সেইখানেই সম্ভবপর, যেখানে জ্ঞায়মান বিষয়টি (অবজেক্ট অব নলেজ) বস্তুত জ্ঞানকালে বর্তমান এবং যাহার সহিত চক্ষুঃ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রকৃত সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। যখন আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে ঘটজ্ঞান হয়, তখন আমাদের ঘটের লৌকিক প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে—কেন না, ঘটটি সত্যসত্যই বর্তমান এবং তাহার সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ সত্যসত্যই স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু যেখানে শুক্তিকায় রজতবুদ্ধি জন্মে, সেখানে রজতের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু উহা অলৌকিক। কেন-না, সত্যসত্যই রজতখণ্ড সেখানে বর্তমান নাই, এবং ফলে উহার সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগাদি সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না। সুতরাং উহা অলৌকিক। এখানে নটে যে দুষ্যন্তবুদ্ধি এবং 'নট যে দুষ্যন্তনিষ্ঠ রতিভাবের আশ্রয়' এই বোধ, এই দুইটিই অলৌকিক প্রত্যক্ষ। কেন-না, ঐতিহাসিক দুষ্যন্ত ব্যক্তি অথবা তন্নিষ্ঠ মুখ্য রতিভাব—ইহাদের কোনটিরই অভিনয়ক্ষেত্রে বাস্তব সত্তা নাই। সুতরাং উহাদের সহিত আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কোনও বাস্তব সম্বন্ধ বা সন্নিকর্ষ স্থাপিত হইতে পারে না। অথচ ঐরূপ সাক্ষাৎকারও সামাজিকগণের অনুভবসিদ্ধ। সুতরাং ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, অভিনয়স্থলে সামাজিকগণের নটব্যক্তিতে যে 'ইনিই দুষ্যন্ত, ইনিই শকুন্তলা-বিষয়ক রতিমান্'—এইরূপ বোধ জন্মিয়া থাকে, উহা সর্বথা আরোপমূলক সাক্ষাৎকার, উহা অলৌকিক প্রত্যক্ষেরই অন্তর্ভূত। এবং সামাজিকগণের চিত্তে অভিনয়দর্শনজনিত যে আনন্দের উদ্রেক হইয়া থাকে, যাহাকে সাহিত্য-

মীমাংসায় 'রসাস্বাদ' বলিয়া অভিহিত করা হয়, তাহা এই আরোপমূলক অলৌকিক সাক্ষাৎকারেরই অপর নামমাত্র, আর কিছুই নহে। নটে যেমন রসের বাস্তব সত্তা নাই, উহা যেমন সাধর্ম্যদর্শনজনিত আরোপ বা উপচারমাত্র, সেইরূপ সহৃদয় প্রেক্ষকের চিত্তে যে আনন্দময় রসানুভূতি উহারও কোন বাস্তব সত্তা নাই, উহা শুধু উপরিবর্ণিত নটে উপচরিত রতির অলৌকিক সাক্ষাৎকারেরই নামান্তর মাত্র।—ইহাই আচার্য ভট্টলোল্লটের স্বকীয় সিদ্ধান্ত।[১]

কিন্তু এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্র৷তবাদিগণ বলিবেন : ভট্টলোল্লট যে বলেন, প্রকৃত 'রস' বাস্তবসম্বন্ধে অনুকার্য দুষ্যন্তাদি নায়কেই আশ্রিত থাকে,—ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না। শকুন্তলার প্রতি দুষ্যন্তের যে রতি উহা তো নিতান্তই পৃথক্‌জনোচিত (laymanlike)। তোমার আমার রতির সহিত মহারাজ দুষ্যন্তের রতির তো কোনই পার্থক্য নাই। উহা তো নিতান্তই লৌকিক। ব্যাবহারিক জগতে রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবের দ্বারা আমরা যেরূপভাবে প্রভাবিত হই, মহারাজ দুষ্যন্তও ঠিক সেরূপভাবেই প্রভাবিত হইয়াছিলেন—ইহাতে কোনও সন্দেহই নাই। লৌকিক রসের অনুভূতির ক্ষেত্রে অহংতা, মমতা, তুমি, আমি, দেশ, কাল প্রভৃতির জ্ঞান যেমন প্রবল থাকে,—মহারাজ দুষ্যন্তের রতিস্থায়িভাবের আস্বাদ বা অনুভূতিও সমানভাবে এই সকল বিশেষণের দ্বারা অবচ্ছিন্ন ছিল, ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। তাহাই যদি হয়,—তবে লৌকিক রসের সহিত মহারাজ দুষ্যন্তের শৃঙ্গারানুভূতির তফাত রহিল কোথায়? সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে মহারাজ দুষ্যন্তের রসানুভূতি নিতান্তই লৌকিক রসানুভূতি। কিন্তু সাহিত্য-পাঠ বা নাট্যাভিনয়দর্শনজনিত যে রসবোধ উহা তো অলৌকিক। উহা তো

১. "মুখ্যতয়া দুষ্যন্তাদিগত এব রসো রত্যাদিঃ কমনীয়বিভাবাদ্যভিনয়প্রদর্শনকোবিদে দুষ্যন্তাদ্যনুকর্তরি নটে সমারোপ্য সাক্ষাৎক্রিয়তে ইত্যেকে। মতেঽস্মিন্ সাক্ষাৎকারো দুষ্যন্তোঽয়ং শকুন্তলাদিবিষয়করতিমান্ ইত্যাদিঃ প্রাগ্‌বদ্ ধর্ম্যংশে লৌকিক আরোপ্যাংশে ত্বলৌকিকঃ।" —রসগঙ্গাধর, পৃ. ৩৩।

উপরিবর্ণিত সমস্ত পরিচ্ছেদের অতীত। কাব্যপাঠজনিত আনন্দময় রসচর্বণার ক্ষেত্রে তো 'আমার এই রস' 'আমার এই নায়িকা' 'আমি এই দেশের অধিবাসী' 'আমি এই কালে বর্তমান'— এইরূপ জ্ঞানধারার যতকিছু সংকীর্ণতা সমস্তই মুছিয়া যায়। এই অনুভূতির সহিত লৌকিক রসানুভূতির সমীকরণ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? সেই জন্যই তো সাহিত্যমীমাংসকগণ সাহিত্যপাঠ অথবা নাট্যাভিনয়দর্শনজনিত রসবোধকে, ইংরেজীতে যাহাকে বলা হয় aesthetic experience, অলৌকিক বলিয়া থাকেন। এই অনুভূতি আর সমস্ত অনুভূতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, ইহার সহিত তুলনা দিবার মত কোনও বিজ্ঞানের অস্তিত্ব নাই,—ইহা সম্পূর্ণ একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী—*sui generis*। আলংকারিকগণ উহাকে 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর' বলিয়াছেন,—কিন্তু উহা যে ব্রহ্মাস্বাদের সহিত একান্তভাবে অভিন্ন নহে, ইহা তাঁহারাও স্বীকার করেন। কবির কাব্যরচনা অথবা নাট্যকারের প্রযোজনার উদ্দেশ্য তো এইরূপ চিত্তবৃত্তির উদ্রেক,—ইহাই তো তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য। কাব্য অথবা নাট্যের তাৎপর্য শুধু এই অলৌকিক চিত্তবৃত্তির উন্মেষসাধনেই—আর কিছুই তো তাহার লক্ষ্য হইতে পারে না। 'কাব্যস্যাতৎপরত্বতঃ'। সুতরাং ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে 'লৌকিক' ভাব মুখ্য রস নহে, প্রকৃত রস হইতেছে 'অলৌকিক সাহিত্যিক রস'। সুতরাং ঐতিহাসিক নায়ক নায়িকাতে এইরূপ চিত্তবৃত্তি কখনই সম্ভব নহে। এই সাহিত্যিক রসের মুখ্য আশ্রয় সহৃদয় পাঠক অথবা প্রেক্ষক সমাজ—অনুকার্য নায়কনায়িকা নহে। সুতরাং ভট্টলোল্লটের মত ভ্রান্ত। দ্বিতীয়ত, ভট্টলোল্লট বলিয়াছেন,—সহৃদয়ের আনন্দানুভূতি,—যাহাকে পারিভাষিকভাবে 'রস' এই সংজ্ঞার দ্বারা অভিহিত করা হয়,—উহা অনুকার্য নায়কনিষ্ঠ মুখ্য রসের অনুকর্তৃ-নটব্যক্তিতে আরোপিত সত্তার অলৌকিক সাক্ষাৎকার বা প্রত্যক্ষ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—আরোপিত রতির সাক্ষাৎকারের ফলে কি কখনও এই জাতীয় ব্রহ্মাস্বাদসহোদর আনন্দানুভূতি সম্ভবপর? চন্দানুলেপনে সুখানুভূতি হয়, ইহা অনুভবসাক্ষিক।

কিন্তু একজনের গাত্রে চন্দনানুলেপন দর্শনমাত্র করিয়া কোনও উদাসীন দ্রষ্টা কি কখনও সেই সুখ অনুভব করিতে পারে? ভট্টলোল্লট বলেন, সহৃদয় প্রেক্ষক অথবা পাঠকের হৃদয়ে কোনও স্থায়িভাবের উদ্রেক হয় না—তাঁহারা কেবল উদাসীন দ্রষ্টা মাত্র। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত তো উপরিবর্ণিত দৃষ্টান্তের সাহায্যে সহজেই ভিত্তিহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।[১] সুতরাং ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে, সহৃদয় পাঠক এবং প্রেক্ষকসমাজই কেবলমাত্র অলৌকিক রসের মুখ্য আধার, অনুকার্য নায়ক নহে। অনুকার্য নায়কনায়িকা শুধু সহৃদয়ের সেই অলৌকিক অনুভূতির উন্মেষের প্রতি কবিকল্পিত উপকরণমাত্র, আর কিছুই নহে।

পরিশেষে একটি বিষয় বিশেষভাবে আলোচনীয়। আমরা দেখিলাম, সাহিত্যিক রসের অনুভবিতা একমাত্র সহৃদয়—নায়কও নহে, নটও নহে। কিন্তু অভিনেতা কি কখনও এই অলৌকিক রসের আস্বাদ লাভ করিবার অধিকারী হইতে পারে না? সে কি শুধু সহৃদয় প্রেক্ষকের মনোবিনোদনের উপকরণমাত্রই হইয়া থাকিবে? ইহার উত্তরে সাহিত্যবিচারকগণ বলেন: যদিও সাধারণ দৃষ্টিতে নট সাহিত্যরসের আশ্রয় হইতে পারে না, তথাপি সে যে নিয়মিতভাবেই রসানুভূতির সীমারেখার বাহ্য হইয়া থাকিবে, ইহাও যুক্তিযুক্ত নহে। নটও কখনও কখনও অভিনয়কালে আত্মবিস্মৃত হইয়া দেশকালাবস্থাতীত রসানুভূতির পরিচয় লাভ করিয়া থাকে,—তন্ময়ীভূত হইয়া আপন পরিমিত সত্তা বিস্মৃত হয়। তখন তাহার অশ্রু, স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, অঙ্গসঞ্চালন প্রভৃতি অনুভাব সত্য সত্যই রসের গমক হইয়া দাঁড়ায়, কেবলমাত্র পরচেষ্টার প্রযত্নকল্পিত রসসম্পর্কবিহীন অনুকরণমাত্রে পর্যবসিত হয় না। তখন সে সহৃদয় গোষ্ঠীর একজন সভ্য হইয়া পড়ে,—বাহ্যদৃষ্টিতে অনুকর্তা হইয়াও তত্ত্বদৃষ্টিতে সে তখন সহৃদয়স্থানাপন্ন। 'নাট্য-

---

১. "চন্দনসুখাদৌ বৈপরীত্যদর্শনাৎ"—কাব্যপ্রদীপ, পৃ. ৬৩।—"ন হি চন্দনারোপশ্চমৎকৃতিহেতুঃ, অপিতু বস্তুতশ্চন্দনসম্বন্ধ এব। তথা সুখমপি নরোপ্যমাণং তথা, কিন্তু বস্তুতো বিদ্যমানমেব।"—বৈদ্যনাথ তৎসৎ : ঐ. টীকা।

দর্পণকার' একটি সুন্দর উদাহরণের সাহায্যে অভিনেতৃনটকর্তৃক রসানুভূতির সম্ভাব্যতা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, পণ্যস্ত্রীগণও,—অনুরাগের মিথ্যা অভিনয়ই যাহাদের একমাত্র জীবিকা, তাহারাও কোনও কোনও সময়ে প্রকৃত প্রেমের বশীভূত হয়; সংগীতকুশল গায়ক গীতিলহরীর সাহায্যে শ্রোতার হৃদয়ে রসসৃষ্টি করিতে যাইয়া আপনার অজ্ঞাতসারে রাগপরবশ হইয়া উঠে। সেইরূপ অনুকর্তা নটও রামাদিগত বিপ্রলম্ভের অনুকরণাবসরে স্বয়ং তন্ময় হইয়া সেই রস অনুভব করিয়া থাকে।' কাব্য-স্রষ্টা

১. "ন চ নটস্য রসো ন ভবতীত্যেকান্তঃ। পণ্যস্ত্রিয়ো হি ধনলোভেন পররত্যর্থং রত্যাদি বিপঞ্চয়ন্ত্যঃ কদাচিৎ স্বয়মপি পরাং রতিমনুভবন্তি। গায়কাশ্চ পরং রঞ্জয়ন্তঃ কদাচিৎ স্বয়মপি রজ্যন্তে। এবং নটোঽপি রামাদিগতং বিপ্রলম্ভাদ্যনুকুর্বাণঃ কদাচিৎ স্বয়মপি তন্ময়ীভাবমুপযাত্যেবেতি তদ্‌গতা অপি রোমাঞ্চাদয়স্তত্র রসং গময়েয়ুরেব।"—নাট্যদর্পণ. পৃ. ১৬০। আধুনিক কোনও কোনও পাশ্চাত্য সমালোচকের মতে নটের রসাস্বাদ ও তন্ময়ীভবন সম্ভবপর হইলেও দর্শকের রসাস্বাদের পক্ষে উহা বিঘ্নস্বরূপ। নট রসবোধ করে করুক, কিন্তু অভিনয়কালে তাহার নিজের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিয়া অনুকার্য নায়কের চিত্তবৃত্তি, অনুভাব প্রভৃতির যথাযথ অনুকরণ করাই তাহার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত,—তবেই তাহার অভিনয়নৈপুণ্য সার্থক। সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতভাবে অনুকার্যনায়কের সহিত নিজে অভিন্ন হইয়া যাওয়া,— প্রেক্ষকের হৃদয়ে রসসৃষ্টির দিক্ দিয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

দ্রষ্টব্য : It has often been supposed—it has often been said, that an actor should think himself into his part, and in order to act most convincingly should forget for the time being that he is not the man he impersonates. That, however, is no more than a popular delusion. It has been effectively dispelled by the great French actor Coquelin, in his book on the art of acting. In that book Coquelin tells the following anecdote.

Another great actor, Edwin Booth, was once taking the chief part in the play *Le Roi s'amuse*...The part was one in which Booth was conscious of having won great success. One evening he satisfied himself that he was acting even better than usual. The power of the situation, the pathos of his lines worked on him so strongly that he completely indentified himself with the character he was representing. Real tears flowed from his eyes, his voice broke with emotion, real sobs choked him. Altogether, it seemed to him that he never acted so well. The performance over, he saw his daughter hastening

কবির রসানুভূতিও তাঁহার সহৃদয়তারই ফল। তাঁহাতে কবি ও সহৃদয়ের পরস্পর সমাবেশ ঘটিয়াছে। কবি হিসাবে তিনি তাঁহার কাব্যজগতের একমাত্র নিয়ন্তা প্রজাপতি, কাব্যের ও নাট্যের পাত্রপাত্রীগণের স্রষ্টিকর্তা। আবার সহৃদয় হিসাবে তিনি স্বকীয় প্রতিভাসৃষ্ট চরিত্রসমূহের সুখ দুঃখ, তাহাদের বিচিত্র অনুভূতির সহিত তাদাত্ম্যাপন্ন। তাঁহারই চিত্তমুকুরে নাটকীয় বিভিন্ন রসের প্রাথমিক প্রতিবিম্ব উদ্‌গৃহীত হয়, সুতরাং তিনিই মূর্ধাভিষিক্ত সহৃদয়।[১] তিনি একাধারে স্রষ্টা ও রসয়িতা। কবির কবিত্ব ও সহৃদয়ত্ব, দুইটি বিভিন্ন তত্ত্ব, কবিপ্রতিভার দুইটি বিভিন্ন দিক—যদিও সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে এই উভয়ের অঙ্গাঙ্গিভাব অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহরণীয়।[২] অতএব রসানুভূতির দিক দিয়া বিচার করিলে কবির সাহিত্যসৃষ্টির কেন্দ্রস্থানীয় ব্যক্তি 'সহৃদয়'। কাব্যসৃষ্টির মূলে যেমন রসানুভূতিপ্রবণ সহৃদয় কবিচিত্ত, পর্যবসানেও সেইরূপ পাঠক ও প্রেক্ষকের আদর্শের মত নির্মল, কাব্যবর্ণিত বস্তুর

---

towards him. She, his most sincere and truest worthy critic, had been watching the stage from a box, and she was now anxious to inquire what was the matter and how it happened that that night he had acted so badly.

Coquelin does not tell this little story for its own sake. His object is to point a moral. In his own words, the moral is that in order to call forth feeling in others we ourselves must not experience it. He does not say that we must never have known it, but only that we must not be undergoing it while we are in the act of trying to arouse it in others. "In all circumstances, the actor," he says, "must retain complete self-control."—Montgomery Belgion: *Reading for Profit*, pp. 28-29.

১. "কবির্হি সামাজিকতুল্য এব। অত এবোক্তং—'শৃঙ্গারী চেৎ কবি'-রিত্যানন্দবর্ধনাচার্যেণ"—অভিনবভারতী: প্রথম ভাগ, পৃ. ২৯৫। অপিচ—"কবেরনুভবশ্চেৎ সহৃদয়ত্বেনৈব নতু কবিত্বেন।" —নাগোজী ভট্ট: রসগঙ্গাধরটীকা, পৃ. ৪।

২. সহৃদয়শিরোমণি আনন্দবর্ধনাচার্য একটি শ্লোকে প্রতিভার এই দ্বৈতস্বরূপ অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন:

"যা ব্যাপারবতী রসান্ রসয়িতুং কাচিৎ কবীনাং নবা
দৃষ্টির্যা পরিনিষ্ঠিতার্থবিষয়োন্মেষা চ বৈপশ্চিতী।"—ধ্বন্যালোকঃ তৃতীয় উদ্দ্যোত।

প্রতিবিম্বগ্রহণক্ষম সহৃদয়চিত্ত। এই উভয়ের মধ্যে আছে—নায়কস্থানীয় সহৃদয় অভিনেতার রসোজ্জীবিত অভিনয়। আচার্য ভট্টতৌত সত্যই বলিয়াছেন: "নায়কস্য কবেঃ শ্রোতুঃ সমানোঽনুভবস্ততঃ।"

৪. ভট্টশঙ্কুক: অনুমিতিবাদ

ভট্টলোল্লটের রসসূত্রের ব্যখ্যা আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে আচার্য শঙ্কুকের মত পরীক্ষা করিব। ভট্টশঙ্কুকের রসবিষয়ক সিদ্ধান্ত সাহিত্য-মীমাংসা শাস্ত্রে 'অনুমিতিবাদ' বলিয়া পরিচিত। আচার্য শঙ্কুক স্বীকার করেন যে, 'রসানুভূতি' কেবলমাত্র সহৃদয় সামাজিকের পক্ষেই সম্ভব।[১] সাহিত্যিক 'রস' কখনও অনুকার্য নায়কের চিত্তে উদয় লাভ করিতে পারে না। ভট্টলোল্লটের মত তিনি রসানুভূতিকে অনুকার্য নায়কের চিত্তবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করেন নাই। সুতরাং এই দিক দিয়া ভট্টশঙ্কুকের মতবাদ আমাদের অনুভবের সহিত মিলিয়া যায়। তিনি সাহিত্যিক ও লৌকিক রসাস্বাদের মধ্যে যে মূলীভূত পার্থক্য আছে তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ইহা তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। আচার্য শঙ্কুকের মতে—"সহৃদয় কর্তৃক স্থায়িভাবের অনুমানই 'রসানুভূতি'।" স্থায়ীর সহিত বিভাব অনুভাব ও সঞ্চারিভাবের পরস্পর অনুমাপ্য-অনুমাপকভাব সম্বন্ধ। স্থায়িভাব 'অনুমাপ্য' (inferable); বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারিভাব— এই তিনটিই অনুমাপক। ভরতাচার্যের রসসূত্রে 'নিষ্পত্তি' পদের অর্থ 'অনুমিতি' (inference)। ধূম যেমন পরোক্ষ বহ্নির অনুমাপক, সেইরূপ বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারিভাবও পরোক্ষ অন্তর্গূঢ় স্থায়ী চিত্তবৃত্তির অনুমাপক। কিন্তু এই যে স্থায়িভাবের অনুমিতি, ইহার আশ্রয় কে? অভিনয়দর্শনের সময় সহৃদয় কোথায় স্থায়িভাবের অনুমান করিয়া থাকে?—অনুকার্য দুষ্মন্ত, রামচন্দ্র প্রভৃতি পাত্রপাত্রীই কি ইহার আশ্রয়, অথবা অনুকর্তা নটেই স্থায়িভাব

১. 'চর্বণা চ সামাজিকানাম্—ইতি তেষ্বেব রস ইতি ব্যবহারঃ'—প্রদীপ, পৃ. ৬৫।

অনুমিত হইয়া থাকে?[১] শঙ্কুক বলেন, সহৃদয় প্রেক্ষক অভিনয়দর্শনের অবসরে অনুকর্তা নটব্যক্তিতেই স্থায়িভাবের অনুমান করিয়া থাকে—অনুকার্য নায়ক-নায়িকাতে নহে। সহৃদয় কর্তৃক অনুমীয়মান স্থায়িভাবের নটই কেবলমাত্র 'পক্ষ'। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে; নট কি প্রকৃতপক্ষে স্থায়িভাবের আশ্রয় হইতে পারে? নট যখন মহারাজ দুষ্যন্তের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার অনুকরণ করিয়া থাকে, তখন সত্যসত্যই কি তাহাতে শকুন্তলাবিষয়ক রতিরূপ স্থায়িভাবের উদয় হয়? যদি না হয়, তবে কি করিয়া অবিদ্যমান স্থায়িভাবের অনুমান সম্ভবপর? যে পর্বতে বহ্নি নাই সেখানে বহ্নির অনুমান কিরূপে প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে? আচার্য শঙ্কুক এই প্রশ্নের অতি সুন্দর সমাধান দিবার চেষ্টা করিয়াছেন: সত্য বটে, প্রকৃতপক্ষে নটব্যক্তিতে কোনও স্থায়িভাবের বাস্তব সত্তা নাই। কিন্তু প্রেক্ষকগণ অভিনয়কালে নটকে নট বলিয়া চিনিতে পারেন না; নটকে দুষ্যন্ত বলিয়াও তাঁহারা সম্যক্ অবধারণ করে না; নট যে দুষ্যন্ত নহে—এইরূপ নিষেধাত্মক জ্ঞানও তাঁহাদের হয় না; আবার, 'এই ব্যক্তি ঠিক দুষ্যন্তের মত' নটবিষয়ক এইরূপ সাদৃশ্য বুদ্ধিও প্রেক্ষকগণের চিত্তে উদিত হয় না; 'এই ব্যক্তি কি দুষ্যন্ত অথবা দুষ্যন্ত নহেন' এইরূপ সংশয়াত্মক বিরুদ্ধোভয়কোটিক জ্ঞানের কোনও চিহ্নও প্রেক্ষকচিত্তে লক্ষিত হয় না; আবার, নটে যে

১. এই স্থলে ন্যায়শাস্ত্রের কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের সহিত পরিচয় থাকিলে সুবিধা হইবে। প্রত্যেক অনুমানের তিনটি বিশিষ্ট অঙ্গ থাকা প্রয়োজন। তাহাদের পারিভাষিক সংজ্ঞা যথাক্রমে 'পক্ষ', 'সাধ্য' ও 'সাধন'। আমরা যখন ধূমের দ্বারা পর্বতে বহ্নির অনুমান করি, তখন পর্বত 'পক্ষ' অথবা 'আশ্রয়', যেহেতু পর্বতরূপ আশ্রয়েই বহ্নির অনুমান হইতেছে; বহ্নি 'সাধ্য' অথবা 'অনুমেয়', এবং ধূম 'সাধন' 'লিঙ্গ' অথবা 'হেতু'। পাশ্চাত্য লজিকে ইহারা যথাক্রমে 'minor term' (S), 'major term' (P) এবং 'middle term' (M) রূপে পরিচিত। সেইরূপ, নটে যখন বিভাবাদির দ্বারা স্থায়িভাবের অনুমান করা হয় তখন নট 'পক্ষ' অথবা 'আশ্রয়', স্থায়িভাবটি 'সাধ্য' বা 'অনুমেয়' এবং 'বিভাব' প্রভৃতি 'সাধন' বা 'হেতু' বা 'লিঙ্গ'।

সাময়িক দুষ্মন্তবুদ্ধি তাহাকে মিথ্যাজ্ঞানও বলা চলে না—কেন-না, মিথ্যাজ্ঞান পরবর্তী সম্যক্‌জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হইয়া থাকে। যেমন, শুক্তিকা-খণ্ডে যে রজতজ্ঞান উহা মিথ্যাজ্ঞান, উহা ভ্রম—যেহেতু উত্তরকালীন 'ইহা শুক্তিকাখণ্ডমাত্র, ইহা রজতখণ্ড নহে'—এই নিশ্চয়াত্মক সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা ঐ পূর্বজ্ঞানটি বাধিত (contradicted) হইয়া থাকে। কিন্তু অভিনয়কালীন নটে যে দুষ্যন্তবোধ উহা কি কখনও পরববর্তী 'এই ব্যক্তি নটমাত্র, দুষ্মন্ত নহে' এইরূপ বিরুদ্ধ বিজ্ঞানের দ্বারা বাধিত হইয়া থাকে? অনুভব বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, অভিনয়ের অবসানে প্রেক্ষাগৃহের বাহিরে আসিলেও অভিনেতাতে যে দুষ্মন্তাদিনায়কবুদ্ধি তাহা কখনও তিরোহিত হয় না, বাধিত হয় না। সুতরাং নটে দুষ্মন্তাদিনায়কবুদ্ধিকে শুক্তিকায় রজতবুদ্ধির মত মিথ্যাজ্ঞান বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তবে সামাজিক-গণের অভিনয়কালীন নটবিষয়ক জ্ঞানকে কোন্ শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায়? আমরা দেখিলাম,—ইহা অবধারণাত্মক সম্যক্‌জ্ঞান নহে; ঔপম্যমূলক সাদৃশ্যজ্ঞান নহে; বিকল্পাত্মক সংশয়জ্ঞানের সহিত ইহার সমীকরণও অসম্ভব; উত্তরকালবাধিত মিথ্যাজ্ঞানের সহিতও ইহার তুলনা হইতে পারে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, সম্যক্, মিথ্যা, সংশয়, সাদৃশ্য—এই চারি প্রকার লৌকিক বিজ্ঞানের কোনটির মধ্যেই সামাজিকগণের অভিনেতৃনটবিষয়ক বিজ্ঞানের অন্তর্ভাব সম্ভব নহে। ইহা লৌকিকজ্ঞানবিলক্ষণ, ইহা অলৌকিক। চিত্রিত তুরগে দর্শকের যেমন তুরগবুদ্ধি জন্মিয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ।[১] চিত্রিত তুরগে যখন তুরগবুদ্ধি হয়, তখন উহাকে যেমন 'ইহা

১. প্রসিদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক ও সমালোচক অধ্যাপক I. A. Richards তাঁহার *Principles of Literary Criticism* গ্রন্থে চিত্রিত ও কাব্যবর্ণিত বস্তুর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাম্য লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং বাস্তবের সহিত উভয়ের যে একটি বৈলক্ষণ্য বিদ্যমান আছে, তাহাও তাঁহার দৃষ্টিতে পড়িয়াছে। দ্রষ্টব্য: "Any familiar activity, when set in different conditions so that the impulses which make it up have to

তুরগই' 'ইহাকে তুরগ বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল বটে, কিন্তু বস্তুত ইহা তুরগ নহে, ইহা কতকগুলি বর্ণের অভিনব সমাবেশমাত্র', 'ইহা কি তুরগ অথবা চিত্রমাত্র ?' 'ইহা ঠিক তুরগের মত'—এইরূপে যথাক্রমে সম্যক্, মিথ্যা, সংশয় এবং সাদৃশ্য এই চতুর্বিধ জ্ঞানের কোনটির মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করিতে পারা যায় না, উহা যেমন সর্বথা অভিনব এক প্রকার প্রতীতি, সেইরূপ সহৃদয় প্রেক্ষকগণের অভিনেতৃনটবিষয়ক প্রতিপত্তিও উপরিবর্ণিত চিত্রতুরগপ্রতীতির ন্যায় সর্বথা অভিনব বিজ্ঞান। সুতরাং সামাজিকগণের নটে যে দুষ্যন্তবুদ্ধি উহা সম্যক্, মিথ্যা, সংশয়, সাদৃশ্য প্রভৃতি লোকপ্রসিদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তি হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ, উহা চিত্রে তুরগবুদ্ধির সহিত উপমেয়। চিত্রতুরগন্যায়েই সামাজিকগণের হৃদয়ে অনুকর্তৃ নটব্যক্তিতে অনুকার্যনায়কবুদ্ধি জন্মিয়া থাকে,—এইরূপ বোধকে কোনও প্রকারে অপহ্নব করিতে পারা যায় না। মনঃসমীক্ষণের দ্বারা যে জ্ঞানের অস্তিত্ব প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে, তাহাকে যুক্তিতর্কের দ্বারা লৌকিক বিচারের দৃষ্টিতে কি করিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যাইবে ?[১]

---

adjust themselves to fresh streams of impulses due to the new conditions, is likely to take on increased richness and fulness in consciousness...This general fact is of great importance for the arts, particularly for poetry, painting and sculpture, the representative or mimetic arts. For in these a totally new setting for what may be familiar elements is essentially involved. Instead of seeing a tree we see something in a picture which may have similar effects upon us but is *not* a tree. The true impulses which are aroused have to adjust themselves to their new setting of other impulses due to our awareness that it is a *picture* which we are looking at. Thus an opportunity arises for those impulses to define themselves in a way in which they ordinarily do not.''

—পৃ. ১০৯ ১১০। আমার মনে হয়, ভারতীয় সমালোচকগণের 'চিত্রতুরগন্যায়বাদ' প্রেক্ষকের চিত্তবৃত্তির স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ইহা অপেক্ষা আরও অধিকদূর অগ্রসর।

১. "ন চাত্র নর্তক এব সুখীতি প্রতিপত্তিঃ। নাপ্যয়মেব রাম ইতি, ন চাপ্যয়ং ন সুখীতি, নাপি রামঃ স্যাদ্ বা ন বায়মিতি, ন চাপি তৎসদৃশ ইতি। কিন্তু সম্যঙ্-মিথ্যা-সংশয়-সাদৃশ্য-প্রতীতিভ্যো বিলক্ষণা চিত্রতুরগাদিন্যায়েন যঃ সুখী রামঃ, অসৌ অয়ম্-ইতি প্রতীতিরস্তীতি। তদাহ—

ভাল কথা,—বুঝা গেল, সহৃদয়চিত্তে চিত্রতুরগন্যায়ে নটে অনুকার্যনায়ক-প্রতীতি জন্মে। সামাজিকগণ কর্তৃক গৃহীত নটই যে রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবের 'পক্ষ' বা আশ্রয়, ইহা কিরূপে স্বীকার করিয়া লওয়া যায়? ভট্টশঙ্কুক বলেন : উপরিবর্ণিত নটরূপ পক্ষেই সামাজিকগণ কর্তৃক 'রতি' প্রভৃতি স্থায়িভাব অনুমিত হইয়া থাকে। কিন্তু সত্যই তো আর নটে রতি প্রভৃতি চিত্তবৃত্তির বাস্তব সত্তা নাই। নট তো কেবল অনুকার্যনায়কের অনুভাবসমূহের অনুকরণমাত্র করিয়া থাকে। ওই সকল অভিনীয়মান অনুভাব তো সর্বথা কৃত্রিম, উহাদের সহিত তো আর আন্তর স্থায়ি চিত্তবৃত্তির কোনও জন্যজনকভাব সম্বন্ধ নাই? ওই সকল অনুভাব অনুকরণ করিতেছে বলিয়া নট যে স্থায়িভাবগুলিও অনুভব করিতেছে ঐরূপ তো কোনও নিয়ম নাই?[১] তবে কি করিয়া স্থায়িভাবের অনুমান সম্ভব? ইহার উত্তরে আচার্য শঙ্কুক বলেন :

"প্রতিভাতি ন সন্দেহো ন তত্ত্বং ন বিপর্যয়ঃ।
ধীরসাবয়মিত্যস্তি নাসাবেবায়মিত্যপি।
বিরুদ্ধবুদ্ধ্যসম্ভেদাদবিবেচিতসম্প্লবঃ।
যুক্ত্যা পর্যনুযুজ্যেত স্ফুরন্ননুভবঃ কয়া।"—ইতি।"

—অভিনবভারতী, ১ম ভাগ, পৃ. ২৭৫।

১. "It is a commonplace that we can show all the signs of fear without actually experiencing fear, the emotion. We may note the signs ourselves and say : "How curious ! I seem to be afraid, but I am not."—C. K. Ogden : *The A B C of Psychology*, পৃ. ১৯৯। তুলনীয়—

"Is it not monstrous that this player here,
But in a fiction, in a dream of passion,
Could force his soul so to his conceit
That from her working all his visage wan'd ;
Tears in his eyes, distraction in's aspect,
A broken voice, and his whole function suiting
With forms to his conceit ? And all for nothing !
For Hecuba ?
What's Hecuba to him or he to Hecuba,
That he should weep for her ?" —*Hamlet*, Act. II, Sc. *ii*.

নটের অনুভাবসমূহ যে কৃত্রিম ইহা সত্য ; কিন্তু সামাজিকগণের দৃষ্টিতে উহা অকৃত্রিম বলিয়াই প্রতিভাত হইয়া থাকে। সামাজিকগণ এইরূপ বুঝিতে পারেন না যে, ওই সকল অনুভাবের সহিত আন্তর স্থায়িভাবসমূহের কোনও সম্পর্কই নাই—উহা কেবল নিছক অনুকৃতি মাত্র। সামাজিকগণের এই বিভ্রমের মূলে আছে অভিনেতৃনটের অভিনয়নৈপুণ্য। নাট্যাচার্যের উপদেশ,[১] দীর্ঘকালের শিক্ষা ও অভ্যাসের ফলে কুশীলবগণ অতি সুষ্ঠুভাবে, রোমাঞ্চ, স্বেদ, স্তম্ভ, গদ্‌গদিকা প্রভৃতি অনুভাবসমূহের আবির্ভাবন করিতে সমর্থ হয়। আলম্বন এবং উদ্দীপন বিভাবসমূহও নাটকের কাব্যাংশ হইতে সহৃদয় কর্তৃক সহজেই গৃহীত হইয়া থাকে ; আবার ব্যভিচারিসমূহও যদিও স্থায়িভাবের মতই পরোক্ষ, তথাপি সেই ব্যভিচারিভাবের অনুগুণ শারীরবিকৃতিসমূহ নট আপন শিক্ষানৈপুণ্যবলে অতি সহজেই প্রকটিত করিয়া থাকে। এইরূপে বিভাবের বাচিক অভিনয়দর্শন, অনুভাবের সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং সঞ্চারিভাবের পরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা[২] সামাজিকগণ নটরূপ আশ্রয়ে অনুগুণ স্থায়িভাবের অনুমান করিয়া থাকে। যদিও স্থায়িভাবসমূহ পরোক্ষ—তথাপি বিভাব, অনুভাব প্রভৃতির প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা তৎসম্পৃক্ত স্থায়িভাবের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। সুতরাং ইহাকে অনুমিতি ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে ?

কিন্তু জিজ্ঞাসা হইতে পারে—দুষ্যন্তরূপী নটে বিভাবাদির দ্বারা শকুন্তলাদি-বিষয়ক রতিস্থায়িভাবের অনুমানই বা হইবে কেন ? নটে দুষ্যন্তের প্রত্যক্ষই হউক না কেন ? ইহার উত্তরে কি বলিব ? এই প্রশ্নের সমাধান নির্দেশ করিবার পূর্বে ইহার অন্তর্গূঢ় তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক, প্রত্যক্ষ ও

---

১. শেক্‌স্‌পীয়রের 'Hamlet' নাটকের কুশীলবদলের প্রতি হ্যামলেটের দীর্ঘ বক্তৃতা এই স্থলে আলোচনীয়—"Speak the speech, I pray you, as I pronounced it to you, trippingly on thy tongue..." ইত্যাদি।—Act. III. Sc. ii,

২. 'তথা চৈতন্যতেঽনুমানাদ্ ব্যভিচারিণামবগম ইতি ভাবঃ'—বৈদ্যনাথ তৎসৎ ঃ কাব্য-প্রদীপটীকা, পৃ. ৬৫।

অনুমানের পরস্পর বলাবল সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বিষয়ের সহিত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষবশত প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মে। কিন্তু অনুমিতি পরোক্ষ জ্ঞান—সাধারণত ইহাতে অনুমেয় বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ ঘটে না। কিন্তু এমনও তো হইতে পরে যে, একই বিষয়ের প্রত্যক্ষ ও অনুমানাত্মক পরোক্ষ জ্ঞানের সামগ্রী বা কারণ বর্তমান রহিয়াছে, তখন কোন্ জ্ঞানটি হইবে ? ধরা যাউক, দর্শকের সম্মুখেই একটি ধূমায়মান বহ্নি প্রজ্বলিত রহিয়াছে—এই স্থানে বহ্নির সহিত দর্শকের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ বিদ্যমান থাকায় বহ্নিবিষয়ক প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের কারণ রহিয়াছে ; আবার বহ্নির সহিত অবিনাভাবী (concomitant) ধূম-দর্শনজনিত বহ্নিবিষয়ক অনুমিতিজ্ঞানের সামগ্রীও যুগপৎ বর্তমান। এ স্থলে বহ্নির প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইবে, অথবা ধূমের দ্বারা বহ্নির অনুমান হইবে ? যুগপৎ দুইটি জ্ঞান তো সম্ভব নহে। কোন্ জ্ঞানটি প্রবল ? দার্শনিকগণ বলেন—এইরূপ স্থলে বহ্নির প্রত্যক্ষই হইবে। কেন না, যে স্থলে প্রত্যক্ষ ও অনুমিতির বিষয় অভিন্ন, সে স্থলে বাধক কোনও সামগ্রী বর্তমান না থাকিলে, প্রত্যক্ষ সামগ্রীই বলবতী, অনুমিতির কারণসমূহ সেইরূপ স্থলে প্রত্যক্ষের সামগ্রীর দ্বারা বাধিত হইবে ; সুতরাং উভয়ের বিষয় (object) যেখানে অভিন্ন, সেখানে প্রত্যক্ষের দ্বারা অনুমান বাধিত হইবে। যেখানে হস্তীকে প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়, সেখানে কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি বৃংহিতের দ্বারা তাহার অস্তিত্ব অনুমান করিতে যান না।[১] উপরিনির্দিষ্ট উদাহরণস্থলে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের বিষয় অভিন্ন —বহ্নিই সেখানে উভয়বিধ জ্ঞানেরই বিষয় ; সুতরাং বহ্নির প্রত্যক্ষই হইবে, অনুমান নহে। কিন্তু যে স্থলে উভয়বিধ জ্ঞানের বিষয় পরস্পর ভিন্ন, সে স্থলে অনুমান সামগ্রীরই প্রাবল্য দার্শনিকগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। যেমন ধরা যাউক—দূরবর্তী অদৃশ্যপর্বতস্থ বহ্নির ধূমরূপ 'লিঙ্গে'র দ্বারা অনুমান হইতেছে। তখন অনুমাতা যিনি, তাঁহার ধূম ও বহ্নির মধ্যে ব্যাপ্তিজ্ঞান

১. 'নহি প্রত্যক্ষেণ করিণি দৃষ্টে চীৎকারেণ তমনুমিমতে পরীক্ষকাঃ'—বাচস্পতি মিশ্র।

(Knowledge of Universal Concomitance) এবং বহ্নিব্যাপ্য ধূমের পর্বতরূপ পক্ষে অবস্থানরূপজ্ঞান (যাহাকে ন্যায়ের পরিভাষা অনুসারে 'পরামর্শজ্ঞান' বলা হইয়া থাকে—এই পরামর্শজ্ঞানই অনুমিতির অব্যবহিত কারণ)। এই উভয়ই তাহার আত্মার সহিত সমবেত হইয়া আছে। আবার দূরস্থিত পর্বতের সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হওয়ায় পর্বতবিষয়ক প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের সামগ্রীও রহিয়াছে। এই স্থলে জিজ্ঞাস্য : পরমার্শজ্ঞানের সাহায্যে পর্বতস্থ বহ্নির অনুমান হইবে, না, চক্ষুঃসন্নিকৃষ্ট দূরস্থ পর্বতের প্রত্যক্ষ হইবে? নৈয়ায়িকগণের মতে এই স্থলে বহ্নিবিষয়ক আনুমানাত্মক জ্ঞানই জন্মিবে। কেন না, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের বিষয় এই স্থলে পরস্পর বিভিন্ন। একটির বিষয় ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট পর্বত, অপরটির বিষয় পরোক্ষ বহ্নি, এবং প্রত্যক্ষ ও অনুমানের যেখানে বিষয়ভেদ বর্তমান, সেখানে অনুমান সামগ্রীই অধিকতর প্রবল—ইহাই দার্শনিকগণের সিদ্ধান্ত। নৈয়ায়িকগণের উপরিবর্ণিত সিদ্ধান্ত দুইটি মনে রাখিলে আমরা পূর্বনির্দিষ্ট প্রশ্নটির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব। যখন সহৃদয় সামাজিক দুষ্যন্তরূপী নটের অভিনয়দর্শনে তন্ময় হইয়া রহিয়াছেন, তখন তিনি দুষ্যন্তরূপী নটকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন, আবার তাহার কৃত্রিম অনুভাব প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিতেছেন। সে সকল অনুভাব নটের আন্তরস্থায়িভাবের পরোক্ষ অনুমানাত্মক জ্ঞানের প্রতি 'লিঙ্গ' বা 'হেতু'। এক্ষণে সামাজিকগণের চিত্তে কি প্রকার জ্ঞান জন্মিবে? "আমি মহারাজ দুষ্যন্তকে প্রত্যক্ষ করিতেছি", এইরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞানই কি উৎপন্ন হইবে, অথবা অনুভাব প্রভৃতির দ্বারা "আমি দুষ্যন্তরূপ 'পক্ষে' রতিরূপ স্থায়িভাবের অনুমান করিতেছি", এইরূপ অনুমিতি জন্মিবে? শঙ্কুকের অনুবর্তী আলঙ্কারিক আচার্যগণ বলেন যে, এই স্থলে নৈয়ায়িক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রতিবিষয়ক অনুমানই উৎপন্ন হইবে। কেন না, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের বিষয় এখানে বিভিন্ন—একটির বিষয় দুষ্যন্তরূপী নট, অপরটির বিষয় মহারাজ-দুষ্যন্তনিষ্ঠ-রতিভাব। সুতরাং অভিনয়-দর্শনের অবসরে প্রেক্ষকগণের চিত্তে "আমি মহারাজ দুষ্যন্তকে প্রত্যক্ষ

করিতেছি" এইরূপ শুদ্ধ প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মে না। কিন্তু, "এই যে মহারাজ দুষ্মন্ত, ইনি শকুন্তলা-বিষয়ক রতিমান, যেহতু ইঁহার ক্ষেত্রে এই জাতীয় বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারিভাব পরিলক্ষিত হইতেছে"—এই প্রকারে দুষ্মন্তে শকুন্তলা-বিষয়ক রতির অনুমানাত্মাক জ্ঞানই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এবং সামাজিকগণের যে আনন্দানুভূতি, তাহা এই বিভাবাদি লিঙ্গের দ্বারা দুষ্মন্তরূপী নটনিষ্ঠ রতিস্থায়িভাবের অনুমিতিমাত্র।[১] সামাজিকের অন্তরে রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবের কোনও অব্যবহিত সম্বন্ধই নাই। স্থায়িভাবের অনুমানেই তাহার আনন্দ, তাহার রসবোধ। শুধু ওই অনুমানজনিত আনন্দানুভূতিরই পারিভাষিক-সংজ্ঞামাত্র।

প্রতিবাদিগণ এই স্থলে জিজ্ঞাসা করিবেন: অনুকর্তা নটে তো রতিপ্রভৃতি স্থায়িভাবের বাস্তব সত্তা নাই। তবে কিরূপে বিভাবাদির দ্বারা স্থায়িভাবের অনুমিতি প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে? শঙ্কুক ইহার উত্তরে বলেন; নটরূপ পক্ষে স্থায়িভাবের বাস্তব সত্তা আছে কি না-আছে—সামাজিকের অনুমিতির দিক দিয়া ঐরূপ সমালোচনার কোন মূল্যই নাই। স্বীকার করিয়া লইলাম—নট প্রকৃতপক্ষে রতিপ্রভৃতি স্থায়িভাবের আশ্রয় নহে, সামাজিক কর্তৃক স্থায়িভাবের অনুমিতি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত; কিন্তু তৎসত্ত্বেও ঐরূপ অনুমিতি যে জন্মিয়া থাকে এবং উহার ফলে সামাজিকগণের হৃদয়ে যে অলৌকিক আনন্দানুভূতি উপলব্ধ হয়, ইহা তো আর অপলাপ করিতে পারা যায় না। সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সহৃদয়ের রসোদ্বোধ। ওই উদ্দেশ্য যদি ভ্রান্ত অনুমিতির দ্বারাও সম্ভবপর হয়, তবে কবিকর্ম সার্থক, ইহা তো স্বীকার করিতেই হইবে। নটে রতির অনুমান ভ্রান্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু উহার দ্বারা 'অর্থক্রিয়া' বা প্রয়োজন-সিদ্ধির কোনও ব্যাঘাতই ঘটে না। উহা ভ্রম হইলেও সংবাদি-ভ্রম, বিসংবাদি-ভ্রম নহে। ভ্রমের দ্বারাও কোনও

১ 'দুষ্মন্তাদিগতো রত্যাদির্নটে পক্ষে দুষ্মন্তত্বেন গৃহীতে বিভাবাদিভিঃ কৃত্রিমৈরপি অকৃত্রিমতয়া গৃহীতৈর্ভিন্নে বিষয়ে অনুমিতিসামগ্র্যা বলবত্ত্বাৎ অনুমীয়মানো রসঃ—ইত্যপরে'—রসগঙ্গাধর, পৃ. ৩৪।

কোনও স্থলে ঈপ্সিত বস্তু লাভ হইয়া থাকে, ইহা তো ব্যাবহারিক জগতে প্রায়ই উপলব্ধ হইয়া থাকে। দূরস্থ প্রদীপ-প্রভা ও মণিপ্রভা দর্শন করিয়া উভয়েরই প্রতি মণিভ্রমে ধাবমান ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি প্রদীপদর্শনে নিরাশ হয়, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি মণি লাভ করে।[১] দুইজনেই সমানভাবে ভ্রান্ত বটে,—কিন্তু একজনের ভ্রম বস্তুসংস্পর্শশূন্য, অপর জন ভ্রান্ত হইলেও ওই ভ্রান্তির সহিত ঈপ্সিত বস্তুর সম্বন্ধ বিদ্যমান। সেইজন্য প্রদীপপ্রভায় মণিবুদ্ধি-আরোপকারীর মণিলাভ ঘটিল না, অপর পক্ষে মণিপ্রভায় মণি-অভিমান ভ্রান্তিমূলক হইলেও ঈপ্সিত মণির সহিত প্রভার সম্বন্ধ ঘটায় প্রমাজ্ঞানের (valid knowledge) মতই উহা ঈপ্সিত-মণিলাভের হেতু হইল। পূর্বটি বিসংবাদি-ভ্রম, দ্বিতীয়টি সংবাদি-ভ্রম। এই সংবাদি-ভ্রম—বিচার-দৃষ্টিতে অপ্রামাণিক হইলেও ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে প্রমাণমূলক, কেন না বিসংবাদি-ভ্রমের ন্যায় উহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নহে, অবিসংবাদি সত্যজ্ঞানের মতই অর্থ-ক্রিয়াকারী। সেইজন্য বৌদ্ধাচার্য ধর্মকীর্তি বলিয়াছেন—"ভ্রান্তিরপি সম্বন্ধতঃ প্রমা"।

সাহিত্যে স্থায়িভাবের অনুমানের ক্ষেত্রেও সেই একই যুক্তি। স্থায়িভাবের অনুমান হয়তো ভ্রান্ত হইতে পারে,—কিন্তু ইহার দ্বারা 'অর্থক্রিয়া'—সহৃদয়ের চিত্তে রসোদ্বোধ, তাহা কখনই ব্যাহত হয় না। সুতরাং ঐরূপ অনুমান অসত্য হইলেও প্রয়োজনসিদ্ধির দিক দিয়া স্থায়িভাবের অনুমিতিপ্রমার মতই সত্য ও বাস্তব। কোনও জ্ঞান সত্য কি অসত্য এইরূপ বিচারের অবকাশ তখনই উপস্থিত হয়, যখন বাহ্যবস্তুর সহিত আন্তর বিজ্ঞানের পরস্পর সংবাদের (correspondence) প্রশ্ন উঠে। নতুবা, বাহ্যবস্তুরনিরপেক্ষভাবে স্ববিশ্রান্ত-ভাবে বিচার করিলে জ্ঞানমাত্রই প্রমাত্মক (valid),—সমস্ত জ্ঞানই স্বরূপত সত্য ও স্বতঃপ্রমাণ। শুক্তিকায় শুক্তিকাবুদ্ধি যেমন প্রমাত্মক, শুক্তিকায়

১. "মণিপ্রদীপপ্রভয়োর্মণিবুদ্ধ্যাঽভিধাবতোঃ।
মিথ্যাজ্ঞানাবিশেষেঽপি বিশেষোঽর্থক্রিয়াং প্রতি॥"—ধর্মকীর্তি।

রজতবুদ্ধিও ঠিক সেইরূপই সত্য ও স্বতঃপ্রকাশ। কিন্তু বাহ্যবস্তুর সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিলেই পূর্বটি সত্য ও অপরটি মিথ্যা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কেন না, প্রামাজ্ঞানটির সহিত বাহ্যবস্তুর সংবাদ (correspondence) বিদ্যমান আছে, কিন্তু শুক্তিকায় রজতজ্ঞানটি বাহ্যবস্তুবিসংবাদি। ব্যাবহারিক লৌকিক জীবনে আমাদের বাহ্যবস্তু লইয়াই নিয়ত ব্যস্ত থাকিতে হয়—শুদ্ধমাত্র জ্ঞান লইয়া আমাদের জীবন ধারণ দুষ্কর। মরুমরীচিকাবুদ্ধি বস্তুনিরপেক্ষ দৃষ্টিতে স্ববিশ্রান্ত ও স্বতঃপ্রমাণ হইতে পারে বটে, কিন্তু তৃষ্ণার্ত পথিক যদি ওই জ্ঞানকে সত্য ভাবিয়া সেই মৃগতৃষ্ণিকার দিকে ধাবিত হয়, তবে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং ব্যাবহারিক জগতে জ্ঞানের সত্যাসত্যত্ববিচার দুষ্পরিহর; কেন না, জ্ঞানজন্য প্রবৃত্তি ও বাহ্যবস্তুকে লইয়াই লোকযাত্রা। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে জ্ঞানের সত্যাসত্যত্ববিচারের উপযোগিতা কতটুকু? এখানে জ্ঞানের সহিত বাহ্যবস্তুর সংবাদ (correspondence) আছে কি না, নটে রতিরূপ স্থায়িভাবের অনুমান বস্তুত নটনিষ্ঠ স্থায়িভাবের বাস্তব সত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত কি না—তাহা লইয়া বিচার করিয়া কি লাভ? ঐরূপ সত্যাসত্যত্ববিচারের দ্বারা রসবোধের কতটুকু উৎকর্ষ বা অপকর্ষ হইবে? সামাজিক কর্তৃক যে স্থায়িভাবের অনুমান—উহা তো স্ববিশ্রান্ত, প্রতীতিমাত্রসার। উহার সত্যত্ব মিথ্যাত্ব বিচার করিয়া তো আমাদের ব্যাবহারিক জীবনের কর্মপ্রণালীর সাফল্য বা ব্যর্থতা কিছুই সাধিত হইবে না। কেন না, উহা ব্যবহারজগতের গণ্ডীর বাহিরে; সাহিত্যচর্চা তো ব্যবহারজগতের নীরস, রূঢ়, নির্মম বস্তুপরতন্ত্রতা হইতে বস্তুসংস্পর্শহীন কাল্পনিক বিশ্বের মধ্যে ক্ষণকালের জন্য আনন্দময় মুক্তি! সেখানে কোনও ব্যাবহারিক প্রয়োজনের তাগিদ নাই—অতএব জ্ঞানের সত্যাসত্যত্ব বিচারের মূল ভিত্তিরই সেখানে একান্ত অভাব। সাহিত্যজন্য যে সকল অনুভূতি, উহারা সত্য-মিথ্যার বাহিরে, উহারা সত্যমিথ্যাবহির্ভূত তৃতীয় এক অলৌকিক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বাহ্য বাস্তবজগতে উহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত কি না, এইরূপ বিচার

বাতুলতা মাত্র।[১] বস্তুত, সামাজিকগণের রতির অনুমান যদি ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে বাস্তবই হইত, সত্য সত্যই যদি নটে রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব বর্তমান থাকিত, তবে সাহিত্যিক অনুভূতির সহিত ব্যাবহারিক অনুমিতির কোনও পার্থক্যই আর থাকিত না। উহা নিতান্তই লৌকিক হইয়া পড়িত। সাহিত্যিক অনুমিতির অলৌকিকত্ব ও চমৎকারিতা এইখানেই যে, ইহার মধ্যে বাস্তবতার সম্পর্ক নাই, ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে উহা অবাস্তব ও মিথ্যা।[২]

বিরুদ্ধ সমালোচকগণ এই স্থলে প্রশ্ন করিয়া বসিবেন : স্বীকার করিয়া লইলাম, সামাজিকগণ কর্তৃক নটে রতি-প্রভৃতি স্থায়িভাবের অনুমান ঘটিয়া থাকে, এবং ওই অনুমিতি সত্যমিথ্যার বহির্ভূত। কিন্তু সামাজিকগণ যে ওইরূপ অনুমিতি হইতে আনন্দানুভব করিয়া থাকেন, ইহা কিরূপে সম্ভবপর? রামের আকার-ইঙ্গিতের দ্বারা 'সে সুখী' অনুমান করিয়া শ্যামের কোন্ সুখ? সহৃদয় দর্শক দুষ্যন্তরূপী-নটে রতির অনুমানমাত্র করিয়া কিরূপে অলৌকিক আনন্দলাভ করিতে সমর্থ হইবে? ইহার উত্তরে আচার্য শঙ্কুক বলেন : ব্যাবহারিক জগতের যে সকল অনুমান উহা তো শুষ্ক তর্ক, উহা তো 'সাধন' বা হেতু হইতে 'সাধ্য' বা অনুমেয়ের জ্ঞানমাত্র। ব্যাবহারিক জগতে আকার-ইঙ্গিতের দ্বারা রামের আন্তর সুখের অনুমান এবং ধূম হইতে বহ্নির

---

১. 'তেনাত্র গম্যগমকয়োঃ সচেতসাং সত্যাসত্যত্ববিচারো নিরুপযোগ এব। কাব্যবিষয়ে চ বাচ্য-ব্যঙ্গ্যপ্রতীতীনাং সত্যাসত্যত্ববিচারো নিরুপযোগ এব—ইতি প্রমাণান্তরপরীক্ষা উপহাসায়ৈব সম্পদ্যত-ইতি।'—মহিমভট্টকৃত 'ব্যক্তিবিবেক', পৃ, ২৫ (কাশী সংস্করণ)। তুলনীয় : "The question of the *reality* of experience does not arise in this region : we are satisfied with the experience itself, simply as such."—Lascelles Abercrombie : *Principles of Literary Crititism*, পৃ. ১৩৬।

২. 'অতঃ প্রতীতিসারত্বাৎ কাব্যস্য অনুমেয়গতং বাস্তবাবাস্তবত্বমপ্রযোজকম্। উভয়থা চমৎকার-লক্ষণার্থক্রিয়াসিদ্ধেঃ। প্রত্যুত অবাস্তবত্বে যথা সিধ্যতি, ন তথা বাস্তবত্বে,—ইতি কাব্যানুমিতে-রেবানুমানান্তরবিলক্ষণতা—ইতি অনুমানবাদিনোঽয়মভিপ্রায়ঃ'—রুয্যকপ্রণীত 'ব্যক্তিবিবেকব্যাখ্যান', পৃ. ৭৪।

অনুমান, এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কিছুই নাই। ধূম যেমন বহ্নির অনুমানের প্রতি হেতু সেইরূপ রামের বাহ্যচেষ্টা, ইঙ্গিত প্রভৃতি তাহার অন্তর্গূঢ় পরোক্ষ সুখের অনুমানের প্রতি 'হেতু', নিতান্তই লৌকিক 'হেতু'মাত্র। কিন্তু সাহিত্যিক অনুমানের যে সকল 'হেতু', বিভাব, অনুভাব প্রভৃতি, উহারা সর্বথা অলৌকিক। উহাদের সহিত তো লৌকিক অনুমানের হেতুর কোনও তুলনাই চলে না। সেই জন্যই লৌকিক জগতে পরকীয় সুখের অনুমান করিয়া আমরা আনন্দ অনুভব করিতে পারি না বটে, ধূম হইতে বহ্নির, মেঘোন্নতি দর্শনে ভাবী বারিপাতের, কৃত্তিকার উদয়-দর্শনে রোহিণী নক্ষত্রের আবির্ভাব অনুমান করিয়া কোনও সৌন্দর্যবোধ না হইতে পারে বটে, কিন্তু নাট্যাভিনয়দর্শনে অলৌকিক বিভাবাদির দ্বারা নটগত স্থায়িভাবের অনুমান করিয়া 'বস্তুসৌন্দর্যবলে' আমরা লোকাতীত আনন্দ অনুভব করিয়া থাকি, ইহা তো অনুভবসিদ্ধ, ইহা কি করিয়া অপহ্নব করিব? দুইটির উপায় ভিন্ন, সুতরাং ফলও যে বিভিন্ন হইবে, ইহাতে বৈচিত্র্য কি?[1]

৫. ভট্টনায়ক : ভুক্তিবাদ

আমরা ভট্টলোল্লটের এবং ভট্টশঙ্কুকের রসবিষয়ক সিদ্ধান্ত আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে আচার্য ভট্টনায়কের রসসূত্রের ব্যাখ্যা পর্যালোচনা করিবার অবসর উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার রসবিষয়ক সিদ্ধান্ত আলঙ্কারিক-সমাজে "ভুক্তিবাদ" বলিয়া পরিচিত।[2]

১. "তদুক্তম্—'নানুমিতো হেত্বাদ্যৈঃ স্বদতেঽনুমিতো যথা বিভাবাদ্যৈঃ।'—ইতি।"—ব্যক্তিবিবেক, পৃ. ৭৪।

২. "ইতি সাংখ্যসিদ্ধান্তানুসারেণ বিবৃণুতে"—কাব্যপ্রদীপ, পৃ. ৬৬।

পরবর্তী টীকাকারগণের মতে ভট্টনায়ক সাংখ্যদর্শনের সিদ্ধান্তসমূহ অবলম্বন করিয়া ভরতের রসসূত্রের তাৎপর্য নিরূপণ করিয়াছেন। সত্যই সাংখ্যদর্শনের অনেক পারিভাষিক সংজ্ঞা ও সাংখ্যদর্শনে বর্ণিত বহু পদার্থও ভট্টনায়কের ব্যাখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই বোধ হয় টীকাকারগণের ঐরূপ মন্তব্যের মূলে।

আমরা দেখিলাম, ভট্টলোল্লট এবং ভট্টশঙ্কুক—রসসূত্রের এই দুইজন পূর্ববর্তী ব্যাখ্যাতা, তাঁহাদের কাহারও মতবাদেই সহৃদয়ের আনন্দময় অনুভূতির সন্তোষজনক বিশ্লেষণ দৃষ্টিগোচর হয় না। ভট্টলোল্লটের মতে মুখ্য রসের আধার অনুকার্য দুষ্মন্ত প্রভৃতি নায়ক, এবং সহৃদয় অনুকর্তা নটে ওই স্থায়িভাবের আরোপ করিয়া উহার অলৌকিক সাক্ষাৎকারের বলে আনন্দ অনুভব করে। ইহা যে সামাজিকগণের সম্পূর্ণ অনুভববিরুদ্ধ, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। পরের সুখ দেখিয়া তটস্থ ব্যক্তির কোন আনন্দই জন্মলাভ করিতে পারে না। আচার্য শঙ্কুক যদিও অভিনেতা নটের স্বরূপ বর্ণনায় অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তির পরিচয় দিয়াছেন বটে, তবুও নটনিষ্ঠ স্থায়িভাবের অনুমানেই সামাজিকগণের অলৌকিক আনন্দানুভূতি আত্মলাভ করে—তাঁহার এইরূপ কল্পনাও সন্তোষজনক নহে। তাঁহার মতেও সামাজিক কেবল তটস্থ, নিরপেক্ষ দর্শক মাত্র। তাহার সহিত স্থায়িভাবের কোনই সম্বন্ধ নাই। সে শুধু উদাসীন দ্রষ্টা মাত্র। পরের সুখ অনুমান করিয়াই তাহার আনন্দ। এই সিদ্ধান্তটিও রসানুভূতির প্রকৃতস্বরূপ উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হয় নাই। আবার রসের অনুভূতি যে নিতান্তই ব্যক্তিগত (personal), সহৃদয় দর্শকের একান্তভাবে আত্মগত, ইহাও বলা যায় না। সহৃদয় কি এইরূপ অনুভব করে যে, এই যে অনুভূতি, ইহা কেবল আমারই, আর কাহারও নহে? অনুভবের এই পরিমিতত্ব (limitedness), এইরূপ দ্বৈপায়ন চিত্তবৃত্তি বা insularity—কি সাহিত্যরসের ক্ষেত্রে সম্ভব? তাহা হইলে, লৌকিক চিত্তবৃত্তির সহিত সাহিত্যপাঠ বা নাট্যদর্শনজনিত অনুভূতির তফাত রহিল কোথায়? ব্যাবহারিক জগতের যে সকল অনুভূতি, সে সকলের মূলেই তো 'অহংতা' (egoism) চিরবিজড়িত হইয়া রহিয়াছে, উহা তো একান্তভাবে আত্মকেন্দ্রিক বা egocentric। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও যদি সহৃদয় আত্মার এই অবিদ্যা-রচিত সংকীর্ণতা,—'নিজের গড়া মিথ্যার প্রাচীর' লঙ্ঘন করিতে না পারে, তবে কবিকল্পিত বিশ্বের সহিত জড়জগতের ভেদ রহিল কোথায়? একটি

কেন লৌকিক এবং অপরটি কি জন্যই বা অলৌকিক বলিয়া পরিগণিত হইবে? সুতরাং ভট্টনায়ক বলেন যে, রস উৎপন্ন হয় না, অনুমিত হয় না; উহা আত্মগতও নয়, আবার পরগতও নয়।[১] যদি বল—রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবের আস্বাদই রসানুভূতি এবং ঐ সকল স্থায়িভাবের আধার শ্রোতা বা প্রেক্ষক স্বয়ং, তবে শৃঙ্গাররসের অনুভবে যেমন সুখবোধ জন্মে, সেইরূপ, করুণরসের অনুভূতিস্থলেও অনুরূপভাবে দুঃখ অনুভূত হয় না কেন? আমরা দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রেমাভিনয় দর্শন করিয়া শৃঙ্গাররসের অনুভূতিবশে সুখে মগ্ন হই, কিন্তু ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্বের বিপ্রয়োগদর্শন করিয়া করুণরসানুভূতির ফলে দুঃখদগ্ধ হই না কেন? যদি শোক নিতান্ত আমারই হইত, তবে ক্রৌঞ্চপত্নীর মত আমিও দুঃখসন্তপ্ত হইতাম, অভিনয়দর্শনের সমস্ত আনন্দ মুছিয়া যাইত। আবার দর্শকের এইরূপ প্রতীতিও জন্মে না যে, শকুন্তলা আমারই কান্তা, সীতা আমারই পত্নী। যদিও বা সাধারণ নায়িকার স্থলে দর্শকের এইরূপ মমতাবোধ জন্মিতেও পারে বটে, তথাপি যেখানে পৌরাণিক দেবদেবী নাটকের নায়কনায়িকার স্থলাভিষিক্ত, সেখানে প্রেক্ষকের এইরূপ মমতাবোধ অসম্ভব, ত্রিভুবনপূজনীয়া দেবী পার্বতী কখনও সামাজিকগত রতিভাবের 'আলম্বন-বিভাব' হইতে পারেন না। যে সকল পৌরাণিক কাহিনী বর্তমান সভ্য-সমাজের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে অসম্ভব, যেমন রামায়ণকথায় হনূমান কর্তৃক সমুদ্রলঙ্ঘন, সেই সকল ব্যাপার যখন নাট্যে অভিনীত হয়, কিংবা কবি কর্তৃক তাঁহার কাব্যে বর্ণিত হয়, তখন প্রেক্ষক বা পাঠকের রসপ্রতীতির তো কোনও বিঘ্ন উপস্থিত হয় না? কিন্তু যদি সামাজিকগণের চিত্তে ব্যক্তিগত সংকীর্ণতা ও মমতাবোধ জাগ্রত থাকিত, যদি সে সমুদ্রলঙ্ঘন প্রভৃতি অলৌকিক চেষ্টাসমূহকে একান্তভাবে আত্মসম্বদ্ধভাবে অনুভব করিত, তবে তাহার ঐরূপ অবিসংবাদিত রসপ্রতীতি কখনই সম্ভবপর হইত না। সহৃদয় দর্শক কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলে'র অভিনয় দর্শন করিয়া যে শৃঙ্গাররসের

১. "ভট্টনায়কস্ত্বাহ—'রসো ন প্রতীয়তে, নোৎপদ্যতে'..."—অভিনবভারতী, ১ম ভাগ. পৃ. ২৭৮।

আস্বাদন করিয়া থাকে উহা যে ঐতিহাসিক মহারাজ দুষ্যন্ত ও আশ্রমকন্যা শকুন্তলার পরস্পর রতিভাবের স্মরণেরই ফল, এইরূপ কল্পনাও যুক্তির দিক দিয়া দুর্বল। কেননা, সেই সকল অতীত বৃত্তান্তেরই স্মরণ সম্ভবপর,—যাহারা পূর্বে অনুভূত হইয়াছে। কিন্তু বর্তমানকালের দর্শক ও শ্রোতা কেহই তো মহারাজ দুষ্যন্ত অথবা তাপসকন্যা শকুন্তলাকে প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাঁহাদের পরস্পর অনুরাগও তাঁহাদের উপলব্ধিগোচর হয় নাই, সুতরাং দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার পরস্পর অনুরাগ বা রতির স্মরণই যে প্রেক্ষকের রসানুভূতির প্রতি কারণ, ইহা কেমন করিয়া স্বীকার করিব? যদি বল, কবিনিবদ্ধ বাক্যসমূহ শ্রবণ করিয়া দুষ্যন্ত শকুন্তলার পরস্পর প্রীতি সম্বন্ধে সামাজিকগণের চিত্তে যে শাব্দবোধ (verbal knowledge) জন্মে, উহাই তাহাদের অলৌকিক আনন্দানুভূতির হেতু, তবে জিজ্ঞাস্য, সাধারণ লৌকিক জীবনে লৌকিক নায়কনায়িকার পরস্পর অনুরাগবর্ণনা শ্রবণ করিয়া শ্রোতার চিত্তে ঐরূপ রসবোধ সম্ভব হয় না কেন? প্রত্যুত, ব্যাবহারিক জীবনে নায়ক-মিথুনের অনুরাগবর্ণনা শ্রবণে শ্রোতার চিত্তে তো লজ্জা, জুগুপ্সা প্রভৃতি ভাবেরই উদয় হয়, সে অনুভূতির মধ্যে তো আনন্দের লেশমাত্র দৃষ্টিগোচর হয় না? ভট্টলোল্লটের উৎপত্তিবাদ কিংবা আচার্য শঙ্কুকের অনুমিতিবাদ—ইহার কোনটিতেই তো উপরিনির্দিষ্ট প্রশ্নসমূহের সন্তোষজনক মীমাংসা লক্ষিত হয় না? লৌকিক ব্যবহারজীবনের ভাষা হইতে কাব্যের ভাষার পার্থক্য কোথায়? লৌকিক পদার্থসমূহের সহিত কাব্যবর্ণিত ও নাট্যাভিনীত বিভাব প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য কি, এবং লৌকিক অনুভূতির সহিত কবিকর্মসমুদ্ভূত রসানুভূতির এইরূপ লক্ষণীয় বিভিন্নতার প্রতি হেতু কি? আচার্য ভট্টনায়ক তাঁহার 'ভুক্তিবাদে' এই সকল সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং বস্তুত তাঁহার মতবাদ অবলম্বন করিয়াই আচার্য অভিনবগুপ্ত তাঁহার 'অভিব্যক্তিবাদে'র ভিত্তি প্রবর্তন করেন,—এ কথা অভিনবগুপ্ত স্বয়ং স্পষ্টভাবে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

কবিকর্মজনিত রসানুভূতির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আচার্য ভট্টনায়ক সাহিত্যের তিনটি বিশিষ্ট ব্যাপার বা function কল্পনা করিয়াছেন, 'অভিধা', 'ভাবনা', এবং 'ভোগীকৃতি'। সামাজিকের রসোদ্বোধের প্রতি এই ব্যাপারত্রয়ের প্রত্যেকটিই অপরিহার্যভাবে অপেক্ষিত। আমরা যথাক্রমে এই তিনটি ব্যাপারের স্বরূপ বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিব।

'অভিধা' বা denotation—ইহা শব্দের ব্যাপার। এই ব্যাপারের বলেই কোন একটি বিশিষ্ট শব্দ একটি বিশিষ্ট অর্থের প্রতীতি জন্মাইয়া থাকে। কবিকর্ম প্রথমত কতকগুলি বাক্যের সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে, এবং বাক্যসমূহ পৃথক পৃথক শব্দেরই সমষ্টি মাত্র। সুতরাং ওই সকল বিভিন্ন শব্দসংঘাত যখন আপন আপন 'অভিধা'-শক্তির সাহায্যে স্ব স্ব অর্থের বোধ জন্মাইয়া দেয়, এবং সামাজিকগণ যখন ওই সকল অর্থের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সমর্থ হয়, তখনই তাহাদের অভীপ্সিত অর্থের প্রতীতি সম্ভব হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কবি তাঁহার কাব্যরচনার দ্বারা সহৃদয়ের চিত্তে যে অভীষ্ট অর্থের প্রতীতি জন্মাইতে চাহেন, উহা কেবল শব্দের অভিধাশক্তির সাহায্যেই সম্ভবপর হয়। কিন্তু বাচ্যার্থবোধ তো কেবলমাত্র সহৃদয়ের কাব্যপাঠ অথবা নাট্যাভিনয়দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়! আমরা এ কথা বারংবার উল্লেখ করিয়াছি যে, সামাজিকের রসপ্রতীতিই সাহিত্যসৃষ্টির প্রধান লক্ষ্য। শুধু বাচ্যার্থবোধের দ্বারা তো অলৌকিক অনুভূতি উদয়লাভ করিতে পারে না! ভট্টনায়ক সেই জন্য কবিকর্মের একটি বিলক্ষণ ব্যাপার কল্পনা করিয়াছেন। ইহার নাম ভাবনা বা সাধারণীকৃতি—ইংরেজীতে যাহাকে বলা হয় universalisation। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, সাহিত্যিক রসোদ্বোধের চারিটি পৃথক উপাদান স্বীকার করিতে হইবে—বিভাব, অনুভাব, স্থায়িভাব ও সঞ্চারিভাব—উহারা অভিধেয় অর্থেরই শ্রেণীবিভাগমাত্র। কেন না, শব্দের অভিধাশক্তির দ্বারা যে সকল অর্থ প্রতীত হয়, তাহারা এই চারিটি উপাদানের যে কোনও একটি শ্রেণীর

অন্তর্ভুক্ত হইবেই। স্থতরাং ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, কাব্যবর্ণিত অর্থসমূহ বিভাব অনুভাব প্রভৃতি চারিটি উপাদানের আকারেই সামাজিকের চিত্তে প্রতিভাত হইবে। কিন্তু লৌকিক কার্য কারণ এবং চিত্তবৃত্তি হইতে সাহিত্যিক বিভাবাদির বৈশিষ্ট্য কোথায়? একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, লোকদৃষ্ট অথবা লোকবর্ণিত অর্থসমূহ দ্রষ্টা অথবা শ্রোতার নিকট হয় একান্ত স্বকীয়ভাবে নতুবা একান্ত পরকীয়রূপে প্রতিভাত হয়। লৌকিকজীবনে আমরা কোনও একটি জিনিসকে, সে বাহ্যজগতেরই হউক, অথবা মনোজগতেরই হউক, হয় একান্ত আমার বলিয়াই গ্রহণ করি, নতুবা উহার সহিত আমার যেন কোনও সম্বন্ধই নাই, উহা নিতান্তই পরকীয়, আমি কেবল উহার উদাসীন সাক্ষী মাত্র, এইরূপ ভাব দেখাইয়া থাকি। ব্যাবহারিক জগতে আমরা কোনও ক্রমেই এই ঐকান্তিক মমতা ও ঐকান্তিক তাটস্থ্য বা ঔদাসীন্য—এই সীমাদ্বয়কে অতিক্রম করিতে পারি না। কিন্তু কবিবর্ণিত বিভাবাদির সহিত সহৃদয় সামাজিকচিত্তের সম্বন্ধ কি ব্যাবহারিক জীবনের এই মমতা ও ঔদাসীন্যরূপ পরিধিদ্বয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? ভট্টনায়ক বলেন: তাহা নহে। সাহিত্যিক রসপ্রতীতির স্থলে কবিবর্ণিত অর্থসমূহ সামাজিকগণের চিত্তে একান্ত আত্মগত অথবা একান্ত তটস্থ কোনরূপেই প্রতিভাত হয় না। বিভাব প্রভৃতি কাব্যবর্ণিত পদার্থসমূহ স্ব-পর-বিকল্পের অতীতরূপে সর্বসাধারণভাবে সহৃদয়ের চিত্তে উপস্থিত হয়। সহৃদয় দর্শকের দৃষ্টিতে শকুন্তলা শকুন্তলারূপে, নিজের প্রেয়সীরূপে প্রতিভাত হন না। কবিকল্পিত শকুন্তলা পাঠকের অথবা প্রেক্ষকের নিকট শুধু একটি symbol মাত্র, আর কিছুই নহে। শকুন্তলা কেবলমাত্র কান্তারূপে সাধারণ সহৃদয়ের চিত্তভূমিতে অবতীর্ণা হন। কবিকল্পিত সীতাদেবী তাঁহার সমস্ত ঐতিহাসিকতা বিসর্জন দিয়া সহৃদয়ের রসানুভূতির বিভাবরূপে আবির্ভূতা হন। তিনি তখন রাজর্ষি জনকের পুত্রী নন, মহারাজ দশরথের কুলপ্রদীপ রামচন্দ্রের প্রেয়সী ভার্যা নন। তিনি তখন দেশকালবিনির্মুক্ত নায়িকার আদর্শ প্রতীক, একটি

universal idea মাত্র। নায়কের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। সুতরাং ঐতিহাসিক সর্বলোকবন্দনীয়া সীতাদেবী যদিও তাঁহার স্বকীয় বিশিষ্টতা লইয়া জনকতনয়ারূপে, মহারাজ দশরথের পুত্রবধূরূপে সহৃদয়ের শৃঙ্গারানুভূতির আলম্বন হইতে পারেন না বটে, তথাপি আদর্শনায়িকার শাশ্বত প্রতীকরূপে, কান্তারূপে তিনি সমস্ত সহৃদয় সমাজেরই আলম্বনবিভাব হইতে পারেন, কোনও বাধাই আর থাকিতে পারে না। 'তা এব চ পরিত্যক্তবিশেষা রসহেতবঃ'। এই স্থলে অনেকে প্রশ্ন করিয়া বসিবেন: সব ক্ষেত্রেই যদি কবিবর্ণিত নায়কনায়িকা আপনাদের স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র সর্বজনীনরূপে সহৃদয়ের নিকট প্রতীত হইয়া থাকে, যদি সীতা এবং শকুন্তলা নিজ নিজ অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়া কেবলমাত্র কান্তারূপে প্রেয়সীরূপে দর্শকচিত্তে আবির্ভূতা হন, তবে নায়িকা যে স্থলে নায়কের সোদরা ভগিনী, সে স্থলে দর্শকের চিত্তে ঐরূপ কান্তাবুদ্ধির, প্রেয়সীবুদ্ধির উদয় হয় না কেন? কেনই বা সেই স্থলে তাদৃশ নায়িকাবিষয়ক শৃঙ্গারানুভূতি দর্শকের চিত্তে উপলব্ধ হয় না? রসগঙ্গাধর-প্রণেতা পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ ভট্টনায়কের বর্ণিত এই সাধারণীকৃতির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সমাধান নির্দেশ করিয়াছেন: কবিবর্ণিত নায়কনায়িকা সহৃদয়ের রসানুভূতির প্রতি 'বিভাব'রূপে কল্পিত হইতে পারে তখনই, যখন ঐরূপ বিভাব হইবার পক্ষে কোনও প্রতিবন্ধক বর্তমান থাকিবে না। 'ভগিনী'তে কান্তাবুদ্ধি জন্মে না, সে সহৃদয়ের শৃঙ্গারানুভূতির 'আলম্বন-বিভাব' হইতে পারে না, কেন না, লৌকিক দৃষ্টিতে ভগিনীর প্রতি প্রণয়মূলক আসক্তি গর্হণীয়। সুতরাং এই লৌকিক সংস্কার অভিনয়দর্শনকালে সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে জাগরূক থাকে, এবং সেই বাধ-জ্ঞানই সহৃদয়ের শৃঙ্গারানুভূতির প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়।[১] করুণ,

১. এইগুলি কেবলমাত্র কতকগুলি দৈশিক ও সামাজিক নিষেধমাত্র—Psychologyতে যাহাদের বলা হয় social inhibitions। যে দেশে বা সমাজে ভগিনীর সহিত প্রণয়সম্বন্ধ রীতিবিগর্হিত নহে, তদ্দেশীয় দর্শকের পক্ষে অভিনয়স্থলে ভগিনীও কান্তারূপে তাহার শৃঙ্গারানুভূতির আলম্বনবিভাব

বীর প্রভৃতি রসান্তরের স্থলেও অনুরূপ বাধ-জ্ঞানের অভাব থাকিলেই নায়ক-নায়িকা সামাজিকের রসানুভূতির 'বিভাব' হইতে পারে। অন্যথা নহে। দুর্যোধনের উরুভঙ্গ দেখিয়া কোনও সহৃদয় দর্শকের চিত্তে করুণরসের উদ্রেক হয় না, কারণ পূর্ব হইতেই তাহার চিত্ত দুর্যোধনের প্রতি বিরূপ হইয়া আছে। এইরূপ পাপিষ্ঠ কিরূপে আমাদের শোকভাজন হইতে পারে; ঈদৃশ দুষ্কর্মকারীর জন্য শোক করা নীতিবিরুদ্ধ—এইরূপ একটি সংস্কার সামাজিকের চিত্তে দৃঢ়মূলভাবে রোপিত থাকে, সেইজন্য দুর্যোধন কখনও প্রকৃত সহৃদয়ের করুণরসানুভূতির আলম্বন হইতে পারেই না। সেইরূপ, নায়কে কাপুরুষত্ব-জ্ঞান বীররসের প্রতিবন্ধক। 'শৃঙ্গারের বিভাব অগম্যা হইবে না', 'করুণের বিভাব অশোচ্য হইবে না', 'বীররসের বিভাব কাপুরুষ হইবে না' এইভাবে প্রত্যেক রসের বিভাবের পক্ষে কতকগুলি নেতিমূলক জ্ঞান (negative judgments) অবশ্যই থাকিতে হইবে। কিন্তু এইস্থলে জিজ্ঞাস্য : ভগিনীর স্থলে কান্তাবুদ্ধি যেমন 'ইনি অগম্যা' এইরূপ সংস্কারপ্রসূত বাধজ্ঞানের ফলে জন্মলাভ করিতে পারে না, শকুন্তলার স্থলেই বা কি জন্য ঐরূপ বাধজ্ঞান কান্তাবুদ্ধির প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায় না? শকুন্তলার প্রতি, সীতার প্রতি প্রীতিও তো তুল্যভাবে নীতিবিরুদ্ধ? অনেকে বলিবেন : সহৃদয় আপনাকে দুষ্যন্ত প্রভৃতি নায়কের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করে, সুতরাং শকুন্তলার প্রতি, কিংবা সীতাদেবীর প্রতি তাহার প্রণয়মূলক আসক্তি বা রতি লৌকিক নিষেধবুদ্ধির দ্বারা বাধিত হইতে পারে না। কিন্তু এই স্থলে জিজ্ঞাস্য : আমি

হইতে পারে, কোনও বাধাই নাই। দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়সমাজে মাতুলসুতার পরিণয় প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত, সুতরাং পিতৃষসার পুত্র ও মাতুলের পুত্রীকে নায়কনায়িকারূপে কল্পনা করিয়া যেখানে নাটক রচিত হইয়াছে, সেখানে দ্রবিড়দেশীয় সহৃদয়ের শৃঙ্গারানুভূতির পক্ষে কোনও বিঘ্নই যে ঘটিবে না—তাহা বলাই বাহুল্য। "স্বমাতুলসুতাং প্রাপ্য দাক্ষিণাত্যস্তু নৃত্যতি"। লৌকিক আচার ব্যবহার ও নীতিবোধ যে আমাদের সাহিত্যিক রসানুভূতির উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, ইহার দ্বারা তাহা সুন্দররূপে প্রমাণিত হয়।

একজন নিঃস্ব প্রাকৃতজন হইয়া নিজেকে কিরূপে সার্বভৌম নরপতি দুষ্মন্তের সহিত অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করিব? আমি একজন আধুনিক কালের নগণ্য মনুষ্য কিরূপে ত্রেতাযুগের রামচন্দ্র হইয়া উঠিব? এইরূপ শত শত বৈষম্য উত্তীর্ণ হইয়া দুইটি বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের মধ্যে কিরূপে অভেদ সাধিত হইবে? ইহার উত্তরে ভট্টনায়ক বলেন : সত্য বটে প্রেক্ষক আপনাকে নায়কনায়িকার সহিত অভিন্নভাবে কল্পনা করিতে পারে না, কেন না, দেশ, কাল, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি শত শত বৈষম্য ঐরূপ অভেদবোধের প্রতিবন্ধক। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কাব্যপাঠ অথবা নাট্যদর্শন হইতে সামাজিকগণের রসবোধের কোনও বিঘ্ন উৎপন্ন হয় না। সীতা, শকুন্তলা প্রভৃতি নায়িকা যেমন তাহাদের সাধারণীকৃত কান্তারূপ পরিগ্রহ করিয়া সামাজিকগণের লোচনের সমক্ষে বিভাবরূপে প্রতিভাত হন, সেইরূপ 'আমি যে দুষ্মন্ত নহি' কিংবা 'রামচন্দ্র নহি' এইরূপ ভেদবুদ্ধিও তখনকার মত স্থগিত বা প্রতিরুদ্ধ হইয়া থাকে। 'আমি দুষ্মন্ত'—বিধিমুখে (positive) এইরূপ অভেদবুদ্ধি না জন্মিতে পারে বটে, কিন্তু 'আমি দুষ্মন্ত নহি'—এইরূপ অসম্ভাবনাও অভিনয়দর্শনকালে সহৃদয় প্রেক্ষকের চিত্তে উদিত হইতে পারে না, এবং এই ভেদবুদ্ধির অভাবই নেতিমূলক হইলেও অভেদবুদ্ধির মতই রসবোধের সহায়তা করে। আমরা Coleridge-এর ভাষায় এইজাতীয় জ্ঞানকে "suspension of disbelief" বলিয়া বর্ণনা করিতে পারি।[১] কিন্তু এইরূপ সংশয় এবং অসম্ভাবনা কাব্যপাঠ অথবা অভিনয়দর্শনকালে সহৃদয় শ্রোতা অথবা দর্শকের চিত্তে উৎপত্তিলাভ করে না কি জন্য? কিরূপে উহা তখনকার মত অবলুপ্ত হইয়া যায়, আচ্ছাদিত হইয়া থাকে? লৌকিক শব্দসমূহ শ্রবণ করিয়া অথবা লৌকিক কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিয়া ওইজাতীয় ভেদবুদ্ধির স্থগন কি জন্য সম্ভবপর হয়

১. "The true stage-illusion in this and in all other things consists not in the mind's judging it to be a forest, but in its remission of the judgement that it is not forest"—Coleridge : Lecture on *The Progress of Drama.*

না? কাব্যপাঠ এবং অভিনয়দর্শনের ক্ষেত্রেই বা কেমন করিয়া রসপ্রতীতি-বিঘাতক অসম্ভাবনাপ্রসূত ভেদবুদ্ধি তিরস্কৃত হইয়া থাকে? আচার্য ভট্টনায়ক এই প্রশ্নের অতি সুন্দর মীমাংসা নির্দেশ করিয়াছেন, এবং পরবর্তী অভিনব-গুপ্তাচার্য প্রমুখ মনীষিবৃন্দ সাহিত্যিক রসানুভূতির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আচার্য ভট্টনায়কের এই সমাধানকেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। ভট্টনায়ক বলেন: কাব্য ও নাট্যের সহিত ব্যাবহারিক শব্দসংঘাত ও লৌকিক প্রত্যক্ষের একটি প্রধান বৈলক্ষণ্য আছে, যাহার ফলে কাব্যবর্ণিত ও নাট্যাভিনীত অর্থসমূহই কেবলমাত্র শ্রোতা ও দর্শকের সমক্ষে সাধারণীভূত হইয়া প্রকাশ পায়, যাহার ফলে সামাজিকের সংকীর্ণ ব্যক্তিত্ববোধ দূর হইয়া আত্মার সহিত নাটকীয় চরিত্রসমূহের ভেদজ্ঞান তাৎকালিকভাবে আচ্ছাদিত হইয়া যায়। কি সেই বৈলক্ষণ্য—যাহার ফলে এই সাধারণীকরণ বা universalisation সম্ভবপর হয়? কাব্যের ক্ষেত্রে দোষাভাব, এবং গুণ (যথা, ওজঃ, প্রসাদ, শ্লেষ প্রভৃতি) ও অলঙ্কারসমূহের যথাযথ সন্নিবেশই এই সাধারণীকরণের মূলে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, কাব্যের সহিত ব্যাবহারিক শব্দপ্রয়োগের পার্থক্য প্রধানত 'বক্রোক্তি' অথবা অলঙ্কার সমাবেশে। এইভাবে বিবিধগুণালঙ্কারমণ্ডিত, দোষসম্পর্কশূন্য শব্দসমূহের গ্রহণের দ্বারা কবি তাঁহার পাত্র, পাত্রী, দেশ, কাল, অবস্থা প্রভৃতি বর্ণনীয় বস্তুসমূহের মধ্যে একটি শাশ্বতরূপ সংযোজনা করিতে সমর্থ হন, এবং তাহাদের মধ্যে এমন একটি বিশিষ্ট শক্তির সঞ্চার করিতে পারেন, যাহা পাঠক অথবা শ্রোতার সংকীর্ণ ব্যক্তিত্ববোধ বিলীন করিয়া দিতে পারে। নাট্যের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সামগ্রী অভিনীত পদার্থসমূহের সাধারণীকরণ বাস্তব করিয়া তুলে। আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য এবং সাত্ত্বিক এই চতুর্বিধ অভিনয়, বিবিধ নাট্যালঙ্কার ও লাস্যাঙ্গ, এবং গীত বাদিত্র ও আতোদ্যের বিচিত্র সমাবেশের দ্বারা অভিনীত পদার্থসমূহ দেশ, কাল এবং অবস্থার সংকীর্ণ পরিধি উত্তীর্ণ হইয়া সর্বদেশকাল-সাধারণ শাশ্বতরূপে সহৃদয়ের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়। সুতরাং এই

সাধারণীকৃতি কাব্যের বিবিধ গুণ, অলংকার, রীতি, ছন্দঃ প্রভৃতি উপাদানের এবং নাট্যের বিচিত্র উপকরণের অলোকসাধারণ শক্তি।[১] অভিনয়ের ক্ষেত্রে রঙ্গপ্রযোজক যে-সকল চিত্র এবং পুস্তকর্মের (scenario) সমাবেশ করেন, পূর্বরঙ্গের অবতারণার সময় রঙ্গালয় যে তৌর্যত্রিকের বিচিত্র নিনাদে মুখরিত হইয়া উঠে, পাত্র-পাত্রীগণের উক্তিসমূহ ভারতী, সাত্বতী, কৌশিকী এবং আরভটী-প্রমুখ নাট্যবৃত্তির যথোচিত সংঘটনাবশে যে অপরূপ ঔজ্জ্বল্য ও মাধুর্যে মণ্ডিত হইয়া উঠে, ওই সমস্তই সহৃদয় দর্শকের পরিমিত সত্তাকে বিস্মরণের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া দিবার জন্যই, এ সকলই অভিনীত পদার্থসমূহকে খণ্ডিত দেশকালের ক্ষুদ্র সীমা উত্তীর্ণ করিয়া দিবার উপকরণমাত্র, তাহার ব্যসনিতার উপকরণ নহে। এই সকল বিচিত্র পরিবেশ ও নাট্যাঙ্গের এমনই অলৌকিক মহিমা যে, অতিশয় অহৃদয় ব্যক্তিও রঙ্গালয়ের পরিধির মধ্যে অবস্থানকালে আপনার অজ্ঞাতসারেই সহৃদয়তায় দীক্ষিত হইয়া রসাস্বাদনক্ষম হইয়া উঠে।[২] গুণ, অলঙ্কার, রীতি, গীত, বাদিত্র, আতোদ্য, লাস্য প্রভৃতি কাব্য ও নাট্যের উপাদানসমূহের বর্ণনীয় ও অভিনেয় পদার্থ-সমূহের অন্তর্নিগূঢ় সর্বজনীনতা প্রকট করিয়া তুলিবার এবং পাঠক ও দর্শকের পরিমিত ব্যক্তিত্বের প্রাচীর ধ্বংস করিয়া তাহার মধ্যে অপরিমিত অহংত্ববোধ জাগ্রত করিয়া তুলিবার এই যে অলৌকিক ক্ষমতা, ইহাই আচার্য ভট্টনায়কের সিদ্ধান্তে 'ভাবনা' ব্যাপার বলিয়া পরিচিত।

কিন্তু কাব্যবর্ণিত বা নাট্যাভিনীত পদার্থসমূহের সাধারণীকৃত দেশকালাতীত

---

১. "তস্মাৎ কাব্যে দোষাভাব-গুণা-লঙ্কারময়ত্বলক্ষণেন, নাট্যে চতুর্বিধাভিনয়রূপেণ নিবিড়নিজমোহ-সঙ্কটতানিবারণকারিণা বিভাবাদিসাধারণীকরণাত্মনাঽভিধাতো দ্বিতীয়েনাংশেন ভাবকত্বব্যাপারেণ ভাব্যমানঃ…" —অভিনবভারতী, ১ম ভাগ, পৃ. ২৭৮।

২. "…সাধারণ্যমহিম্না সকলভোগ্যত্বসহিষ্ণুভিঃ শব্দাদিবিষয়ময়ীভি-(রৈ ?)-রাতোদ্য-গান-বিচিত্রমণ্ডপ-পদ-বিদগ্ধগণিকাদিভিরুপরঞ্জনং সমাশ্রিতং, যেনাহৃদয়োঽপি হৃদয়-বৈমল্যপ্রাপ্ত্যা সহৃদয়ীক্রিয়তে।…" —ঐ. পৃ. ২৮২-৮৩।

রূপের প্রতীতিই তো সহৃদয়ের রসাস্বাদের চরম কথা নহে। রসচর্বণাজনিত সামাজিকচিত্তে যে অলৌকিক আনন্দের উদ্ভব হয়, তাহার হেতু কি? ঐ আনন্দাংশের উৎস কোথায় নিহিত আছে, এবং কোন্ ব্যাপার বলেই বা সেই রুদ্ধ উৎসমুখ নিঃসারিত হয়? ভট্টনায়ক রসচর্বণায় এই আনন্দানুভূতির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সহৃদয়চিত্তের একটি বিশিষ্ট ব্যাপার (function) স্বীকার করিয়াছেন, যাহার নাম 'ভোগীকৃতি'। 'অভিধা' এবং 'ভাবনা'—পূর্ববর্ণিত এই দুইটি ব্যাপার যথাক্রমে 'শব্দ' ও 'অর্থের' স্বতন্ত্র শক্তি। কিন্তু 'ভোগীকৃতি' সম্পূর্ণরূপে সহৃদয়ের আন্তর ব্যাপার—ইহা একটি psychical process; সহৃদয়চিত্ত তখন বাহ্যবস্তু হইতে সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্ত হইয়া আন্তরজগতের সাধারণীকৃত বিজ্ঞানমাত্রসার পদার্থসমূহের আস্বাদ গ্রহণে ব্যস্ত, উহা তখন একান্তভাবে অন্তর্মুখ। বিভাব, অনুভাব, স্থায়িভাব, সঞ্চারিভাবের সাধারণীকৃতির ফলে মানবচিত্তের যে স্বাভাবিক আসক্তি ও গ্রহণবর্জনস্পৃহা, তাহা তখনকার মত তিরোভূত হয়। ত্রিগুণাত্মক চিত্তে তখন রজোগুণ ও তমোগুণ ক্ষণিকের জন্য আবৃত ও অভিভূত হইয়া থাকে, সুতরাং ঐ গুণদ্বয়-জনিত চাঞ্চল্য ও জড়তা, দুঃখ ও মোহ সহৃদয়ের অনুভূতির ক্ষেত্র হইতে নির্বাসিত হয়। সহৃদয়ের অন্তঃকরণ সেই সময়ে সত্ত্বগুণের উদ্রেকের ফলে নিরতিশয় স্বচ্ছতা লাভ করে। তাহার মধ্যেই সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দময় পরব্রহ্ম—শৈবপ্রত্যভিজ্ঞাবাদিগণের মতে যিনি 'পরমশিব', আপনার অখণ্ড স্বরূপে প্রকাশমান হন। চিত্ত তখন নির্বিষয়, স্থির, মোহবিনির্মুক্ত,—আনন্দ ও বিজ্ঞানের আকর পরমশিবের সহিত ঐকাত্ম্যসূত্রে সম্বদ্ধ। বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত হওয়ায়, রজোবৃত্তির উদ্রেকবশত যে চাঞ্চল্য,—সাংখ্যপ্রস্থানের আচার্যগণের মতে যাহা সমস্ত দুঃখের নিদান, সেই অস্থৈর্য ও চাঞ্চল্য তখন লুপ্ত। ত্রিগুণাত্মক চিত্তের সত্ত্বগুণের উদ্রেকের ফলেই চৈতন্যের স্বরূপাবরক সমস্ত মল দূরীভূত হয়। পূর্ণপ্রকাশমান আত্মচৈতন্য তখন উচ্ছলিত, অপরিমিত স্বরূপানন্দের আস্বাদনে মগ্ন। বেত্তা ও বেদ্য তখন অভিন্ন, গ্রাহ্য ও গ্রাহকের

মধ্যে, ভোক্তা ও ভোগ্যের মধ্যে কোনও ভেদ তখন থাকে না। এই আস্বাদন একঘন—সমস্ত বিজাতীয় বিষয়চিন্তা হইতে নির্মুক্ত। কাব্যের ও নাট্যের লোকাতীত মহিমাবশে, স্বভাবত চঞ্চল ও দুঃখযোনি চিত্তে সত্ত্বোদ্রেকবশে চিদানন্দঘন আত্মতত্ত্বের এই একান্তভাবে বহির্বিষয়পরাঙ্‌মুখতা, বিষয়োপরাগবিনির্মুক্তি ও স্বরূপবিশ্রান্তি—ইহাই কবিকর্মজনিত আনন্দানুভূতির নিগূঢ় রহস্য। এইক্ষণে আত্মা বা পরমশিবের যত কিছু অবিদ্যারচিত আবরণ বা মল, সে সকলই অকস্মাৎ অপগত হয়। তখন অহংতাবোধ থাকে বটে, কিন্তু সে অহংতা (egoism) সর্বব্যাপক,—ব্যাবহারিক জীবনের খণ্ডিত, পরিচ্ছিন্ন 'অস্মিতা' নহে। ব্যাবহারিক জীবনের অস্মিতা ও মমতা কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ের সীমার মধ্যে সম্বদ্ধ—দেহ আমার, পুত্র আমার, ঐশ্বর্য আমার, ভার্যা আমার, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি দরিদ্র, আমি ধনী এইরূপ। কিন্তু যখন কাব্যের সাধারণীকৃতি ও ভোগীকৃতির মহিমাবশে এই পরিচ্ছিন্ন অহংতাবুদ্ধি লুপ্ত হয়, তখন বিশ্বের সমস্ত পদার্থই, ক্ষুদ্র দেহপিণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া সীমাহীন ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত যত কিছু সমস্তই আমার হইয়া দাঁড়ায়। সকলের মধ্যেই আমি নিজের আত্মাকে অনুভব করি। "সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।" আমি যেমন মানুষ, তেমনি আমি নদী, পর্বত, তরু, লতা, ওষধি, হস্তী, অশ্ব, সরীসৃপ, বিহঙ্গম সমস্তই আমি। আমার ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ যেমন আমার, সেইরূপ জগতের সকল প্রাণীর সুখ-দুঃখ, চিন্তা, প্রবৃত্তি সমস্তই তুল্যভাবে আমার। শৈবপ্রত্যভিজ্ঞাবাদিগণের মতে এই যে ব্যাপক অহংতা ও মমতাবোধ, ইহার সহিত বৈদান্তিক দার্শনিকগণের অহঙ্কার ও মমকারের একান্ত শূন্যতা ও বিলুপ্তি—তাহার কোনও পার্থক্য নাই। সর্ববিধ সৃষ্টিকে 'আমি' ও 'আমার' বলিয়া চিন্তা করা এবং অহংজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিলয়—'আমি ও আমার বলিয়া কিছুই নাই' এইরূপ বুদ্ধি, পরস্পর অভিন্ন। একটির দ্বারা যেমন আপনার খণ্ডিত অহংতাজ্ঞানকে বিনষ্ট করিয়া তত্ত্বদৃষ্টি লাভ করিতে পারা যায়, অপরটিও সেইরূপ তুল্যভাবে মুক্তির সোপান। পূর্ণতা

শুধু শূন্যতারই নামান্তর মাত্র। এই দুইয়ের মধ্যবর্তী অবস্থাই, খণ্ডিত ও পরিচ্ছিন্ন অহংতাবোধই কেবলমাত্র সমস্ত দুঃখের হেতু—অবিদ্যার আধার। সেইজন্য একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক বলিয়াছেন: "অহংকার ত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু তাহা যদি দুষ্কর হয়, তবে অহংকারকেই আশ্রয় করিবে। কিন্তু সেই অহংবুদ্ধি সর্বত্র সমানভাবে জাগরূক থাকা চাই।"[১] সাহিত্যে রসাস্বাদনের স্বরূপ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা আপাতদৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ হইলেও, নিপুণভাবে বিচার করিয়া দেখিলে ইহার উপযোগিতা ধরা পড়িবে। সহৃদয় দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলী অভিনয় ও কাব্য-পাঠের অবসরে কবিবর্ণিত প্রত্যেক চরিত্রের সহিতই আসক্তিশূন্য ঐকাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া থাকে। আমি দুষ্যন্ত, আমি শকুন্তলা, আমি অনসূয়া, আমি প্রিয়ংবদা, আমি কণ্ব, আমি বিদূষক—অথচ আমি দুষ্যন্ত নই, শকুন্তলা নই, অনসূয়া নই, প্রিয়ংবদা নই, কণ্ব নই, বিদূষক নই।[২] সমস্ত চরিত্রের মধ্যেই এই

---

১. "ত্যক্তব্যোঽহংকারঃ কিন্তু স যদি নৈব শক্যতে ত্যক্তুম্।
কর্তব্যোঽহংকারঃ কিন্তু স সর্বত্র কর্তব্যঃ।"—অপ্পয়দীক্ষিত

২. ভারতীয় দর্শনে আত্মার জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত হইয়া থাকে। কত যুগযুগান্তর ধরিয়া ক্লেশ ও কর্মবিপাকবশত কত বিচিত্র জাতি, আয়ু ও ভোগের মধ্য দিয়া আমার আত্মা প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, সেই সকল ক্লেশকর্মবিপাকানুভবজনিত বিচিত্র বাসনা আমার চিত্তভূমিকে চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছে, বহুবর্ণ তন্তু যেমন পটকে বিচিত্র করিয়া রাখে, ঘনসন্নিবিষ্ট গ্রন্থি যেমন মৎস্যজালকে চিত্রিত করিয়া রাখে। সুতরাং উপযুক্ত উদ্বোধক হেতুর সদ্ভাবে সেই সকল বিচিত্র বাসনাও উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে, ইহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। পাতঞ্জল যোগসূত্রের ভাষ্যকার মহর্ষি ব্যাস বলিয়াছেন: "ক্লেশকর্মবিপাকানুভবনির্বর্তিতাভিস্তু বাসনাভিরনাদিকালসম্মূর্চ্ছিতমিদং চিত্তং বিচিত্রীকৃতমিব সর্বতো মৎস্যজালং গ্রন্থিভিরিবাততম্"।—যো. সূ. ভাষ্য ২.১৩। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র কয়েকটি কবিতায় ও 'জীবনদেবতা' তত্ত্বে বিচিত্র জন্ম ও অনুভূতির মধ্য দিয়া আত্মার এই অগ্রগতির তথ্যটি পরিস্ফুট হইয়াছে। যেমন, "যুগে যুগে এসেছি চলিয়া, স্খলিয়া স্খলিয়া, চুপে চুপে, রূপ হতে রূপে, প্রাণ হতে প্রাণে।" (বলাকা. ৮); "প্রাচীন কালের পড়ি ইতিহাস / সুখের দুখের কাহিনী / পরিচিতসম বেজে ওঠে সেই / অতীতের যত রাগিণী // পুরাতন সেই

আত্মানুভূতি সম্ভব হয় শুধু সর্বব্যাপক আত্মচৈতন্যের আবরক মলাপসরণের ফলে, উপরিবর্ণিত পূর্ণ অহংতাবোধের স্ফুরণের ফলে। এমন কি, রামায়ণ-

---

গীতি / সে যেন আমারি স্মৃতি / কোন্ ভাণ্ডারে সঞ্চয় তার / গোপনে রয়েছে নিতি / প্রাণে তাহা কত মুদিয়া রয়েছে / কত বা উঠিছে মেলিয়া / পিতামহদের জীবনে আমরা / দুজনে এসেছি খেলিয়া। /"—ইত্যাদি। অভিনয়ের স্থলে সহৃদয় সামাজিক যে স্ত্রী ও পুরুষ, পাত্র ও পাত্রীর বিচিত্র অনুভূতিসমূহের সাহত ঐকাত্ম্য স্থাপন করিতে সমর্থ হয়, তাহাও ওই একই কারণে। আধুনিক শারীরবিজ্ঞানের গবেষণার দ্বারাও সহৃদয়ের এই অনুভূতি সমর্থন করিতে পারা যায়। প্রত্যেক প্রাণিদেহের গঠনের মধ্যেই স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই লক্ষণ বিদ্যমান আছে, ফলে তাহাদের মানসিক গঠনও উভয়লক্ষণাক্রান্ত। আমরা কেহই দৈহিক বা মানসিক, কোনও দিক দিয়াই পূর্ণ পুরুষ বা পূর্ণ স্ত্রী নহি—আংশিক পুরুষ এবং আংশিক স্ত্রী। তবে অংশের মধ্যে তারতম্য আছে বটে। সুতরাং আমাদের দেহ ও মনের এই দ্বিলিঙ্গতার (bisexuality বা hermaphroditism) ফলে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়বিধ পাত্র পাত্রীর অনুভূতির সহিত আমরা নিজেদের ঐকাত্ম্য স্থাপন করিতে সমর্থ হই এবং ইহা বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্মত। তুলনীয়—

"For a long time it was believed, not only by the ignorant but also by the instructed, that masculine and feminine were two antagonistic and profoundly differentiated entities. Man and woman were set widely apart in our minds, and the concept of the integrity of our own sex was maintained as an inviolable characteristic of personality. To cast any doubt on one's manhood or one's womanhood was regarded as an insult, especially to the male. Because of this attitude, all intersexual states, whether they affected the physical state (hermaphroditism) or the psychological make up (intersexual conditions, homesexuality), were looked upon either as repulsive monstrosities or else as heinous sins.

"As a result of our biological survey, we are in a position to see that this was an entirely false way of looking at sex, and that we must change our views The two sexes, masculine and feminine, are not two separate and distinct entities standing widely apart. Rather must we regard them as two conditions that may approach each other and 'end by fusing in a phase of primitive ambiguity' (Maranon). In every male lurks a female, in every female a male, sometimes so arrogant as to mask the true personality, sometimes so shy as to be scarcely perceptible. No longer can we speak of the

পাঠকালে হনূমানের সাগর লঙ্ঘন প্রভৃতি অলৌকিক কার্যও তখন প্রকৃত সহৃদয়ের নিকট অপ্রাকৃত বলিয়া বোধ হয় না, উহার মধ্যেও তখন আমিত্ববোধ অনুস্যূত হইয়া থাকে। এই পরিপূর্ণ অহংতার স্ফুরণের দ্বারাই চিরাতীত ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষীকরণ ও শ্রবণের ফলে কোনও বাধবুদ্ধির উদয় হয় না,—কেন না, আমাদের অন্তর্গুহাশায়ী যে অখণ্ড, পরিপূর্ণ আত্মচৈতন্য বা পরমশিব, তিনি সমস্ত কালের সহভাবী,—তিনি অতীত, অনাগত ও বর্তমান প্রত্যেকের মধ্যে আছেন। এই পরিপূর্ণ আত্মতত্ত্বের অবচ্ছেদক কোনও জাতি (genus) নাই, ব্যক্তি (gender) নাই, দেশ নাই, কাল নাই। সেই জন্যই সহৃদয় পুরুষ ও রমণী, বালক ও বৃদ্ধ—প্রত্যেক পাঠক ও দর্শক সমানভাবে নাট্যবর্ণিত সর্বজাতীয় পদার্থের সহিত সহানুভূতি বোধ করিতে সমর্থ হন। সীতার দুঃখে যেমন আমরা কাতর হই, হনূমানের বীরত্বে তেমনই উৎসাহিত হই, আবার মহারাজ দুষ্মন্ত কর্তৃক অনুগম্যমান ত্রস্ত মৃগপোতকের ভীতিও[১] আমাদের

'male type' and of the 'female type', but rather of a series of infinite gradations "which extend from a flagrant hermaphroditisn to forms so alternated that they merge into normality itself" (Maranon)."—*The Physiology of Sex*: Kenneth Walker. পৃ. ৩২-৩৩ (Pelican Books. 1945). Freudও বলেন: "A certain degree of anatomical hermaphroditism really belongs to the normal. In no normally formed male or female are traces of the apparatus of the other sex lacking... The conception which we gather from this long known anatomical fact is that there is an original predisposition to bisexuality, that in the course of development this changes to monosexuality, leaving only slight remnants of the stunted sex.

"It was natural to transfer this view to the psychic sphere and to concieve the inversion in its aberrations as an expression of psychic hermaphroditism." —Sigmund Freud: *Three Contributions to the Theory of Sex*, পৃ. ৫৫৮ (*The Basic Writings of Sigmund Freud*: The Modern Library, New York, 1938).

১. যাঁহারা প্রসিদ্ধ ছায়াশিল্পী Walt Disney'র দ্বারা চিত্রিত ও প্রযোজিত *Bambi* ছায়াচিত্র দর্শন করিয়াছেন,—তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, একটি সামান্য তির্যকপ্রাণীর, ক্ষুদ্র

চিত্তে সমানভাবে ভয়ানক রসের রসের সঞ্চার করে,—এই দেশ-কাল-বয়োবস্থা-জাতি-ব্যক্তি প্রভৃতি ব্যাবহারিক অবিদ্যারচিত অবচ্ছেদক বা limitation-এর অতীত আত্মচৈতন্যের স্বাভাবিক নিরবচ্ছিন্ন পূর্ণ অহংতাবোধ প্রত্যেকের সহিতই সমানভাবে অনুস্যূত হইয়া থাকে। সুতরাং অভিনয়দর্শনকালে সহৃদয় প্রেক্ষকের চিত্তে যে অলৌকিক প্রতীতির উদয় হয়, উহা যেমন এক দিকে একান্ত ব্যাপকভাবে personal বা আত্মকেন্দ্রিক, অপর দিক দিয়া বিচার করিলে উহা সম্পূর্ণ impersonal বা নৈর্ব্যক্তিক। কেন না, যে অহংজ্ঞানের মধ্যে কোনও খণ্ডতা নাই, তাহা অহংকারশূন্যতারই নামান্তর। পূর্বেই বলিয়াছি—অখণ্ড শূন্যতা ও অখণ্ড পূর্ণতা বিচারদৃষ্টিতে এক ও অভিন্ন। এই জন্যই আচার্য ভট্টনায়ক সহৃদয়ের রসচর্বণাকে যোগিগণের ব্রহ্মাস্বাদের সহিত তুলনা করিয়াছেন। উভয় ক্ষেত্রেই পরিপূর্ণ অহংতাবোধ, সত্ত্বোদ্রেক, চৈতন্যের অন্তর্মুখীনতা, স্বসংবেদন ও আনন্দনির্ভাস সমান।[1] তবে উভয়ের মধ্যে পরস্পর ভেদ কোথায়? সাহিত্যিক রসাস্বাদ ও জীবন্মুক্ত যোগীর আত্মসাক্ষাৎকারজনিত আনন্দচর্বণার প্রকার এক হইলেও একটু বৈশিষ্ট্য আছে। যোগিগণের সাক্ষাৎকার বাহ্য ও আন্তর সমস্ত বিষয়ের সহিত অসংস্পৃষ্ট। কিন্তু সহৃদয়ের রসচর্বণা অন্তর্মুখীন হইলেও বাহ্যবস্তুর দ্বারা অনালিঙ্গিত হইলেও, আন্তর রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবের প্রতিভাসের দ্বারা শবলিত। আত্মচৈতন্য যেমন স্বমহিমায় প্রকাশ পাইতে থাকে, সেইরূপ ওই চৈতন্যের

মৃগশিশুর জন্ম ও কৈশোরবৃত্তান্ত মানবের জীবননাট্যের মতই সহৃদয়ের চিত্তে বিভিন্ন রসের উদ্রেক করিতে পারে ও তাহাতে পরিপূর্ণ অহংতাবোধের জাগরণের প্রতি কোনই প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয় না।

১. "পাঠ্যাদথ ধ্রুবাগানাৎ ততঃ সম্পূরিতে রসে।
তদাস্বাদভরৈকাগ্রো হৃষ্যত্যন্তর্মুখঃ ক্ষণম্॥
ততো নির্বিষয়স্যাস্য স্বরূপাবস্থিতৌ নিজঃ।
ব্যজ্যতে হ্লাদনিষ্যন্দো যেন তৃপ্যন্তি যোগিনঃ॥"—ব্যক্তিবিবেক, পৃ, ৯৪

স্ফুরণের দ্বারা আন্তর রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবও প্রকাশিত হইয়া উঠে। সেইজন্যই ভট্টনায়ক রসচর্বণাকে 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর' বলিয়াছেন। সুতরাং রসচর্বণায় আত্মার আনন্দ ও চৈতন্যাংশ রাত প্রভৃতি স্থায়িভাবের দ্বারা উপরক্ত—ঐ সকল স্থায়িভাব চিদানন্দময় ব্রহ্মের উপাধি বা adjunct মাত্র। সেইজন্যই শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র প্রভৃতি বিভিন্ন রসানুভূতির স্থলে আনন্দোপলব্ধি যদিও সর্বসাধারণ, তথাপি সেই আনন্দের মধ্যে প্রকারভেদ আছে—বৈলক্ষণ্য আছে। একই স্ফটিকখণ্ড যেমন জপা, নীলোৎপল প্রভৃতি কুসুমের সান্নিধ্যবশত যথাক্রমে রক্ত নীল প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের দ্বারা রঞ্জিত হইয়া পৃথক বলিয়া প্রতিভাত হয়, সেইরূপ স্বরূপাবস্থিত আত্মচৈতন্যের নৈসর্গিক আনন্দ যদিও অপরিণামী ও ভেদশূন্য, তথাপি কাব্য ও নাট্যের ভাবনাব্যাপারের বশে রতিপ্রভৃতি বিচিত্র স্থায়িভাব যখন হৃদয়সংবাদক্রমে সহৃয়ের অন্তরের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া নিরাবরণ চৈতন্যের সান্নিধ্যে উপস্থাপিত হয়, তখন সেই সেই স্থায়িভাবের দ্বারা উপরঞ্জিত আনন্দও স্বরূপত অভিন্ন হইলেও সহৃদয়ের অনুভূতিতে বিভিন্ন আকারে প্রতিভাসিত হইয়া উঠে। এই জন্য শৃঙ্গারে আমরা যে আনন্দ অনুভব করি, করুণরসের চর্বণাজনিত আনন্দোপলব্ধি হইতে উহা বিলক্ষণ। কেন না, প্রথমটিতে আনন্দাংশের উপাধি রতি, দ্বিতীয়টিতে শোক।

সুতরাং ভট্টনায়কের মতে রসচর্বণার উপযোগী ব্যাপারত্রয় কল্পনা করিতে হয়। অভিধা, ভাবনা এবং ভোগীকৃতি। এই তিনটির মধ্যে 'ভোগীকৃতি' ব্যাপারটিই মুখ্য, অন্য দুইটি তাহারই অঙ্গমাত্র। সেইজন্য ভট্টনায়ক বলিয়াছেন: 'দ্বয়োগু্র্ণত্বে ব্যাপারপ্রাধান্যে কাব্যগীর্ভবেৎ।'

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, পরবর্তী টীকাকারগণ ভট্টনায়কের উপরিবর্ণিত 'ভুক্তিবাদ'কে সাংখ্যসিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কল্পনা করেন। সত্য বটে,—সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই গুণত্রয় ভট্টনায়ক স্বীকার করিয়াছেন, এবং সাংখ্যদর্শনই উহাদের আকর। কিন্তু পাতঞ্জল, বেদান্ত প্রভৃতি অন্যান্য

দার্শনিক প্রস্থানও সাংখ্যদর্শনের ঐ গুণত্রয়বাদ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ইহার দ্বারা ভট্টনায়কের মতবাদ যে সাংখ্যসিদ্ধান্তের ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত—এইরূপ নিঃসন্দেহ উক্তি যুক্তির দিক্ দিয়া দুর্বল। সত্ত্বগুণের উদ্রেক এবং রজঃ ও তমোগুণের অভিভবের ফলে অন্তরে যে সুখ ও নৈর্মল্যের অভিব্যক্তি ঘটিয়া থাকে, ইহা কেবল সাংখ্যদর্শনেরই সিদ্ধান্ত নহে, পরন্তু অধিকাংশ আস্তিক্য-দর্শনেরই সাধারণ সিদ্ধান্ত—পারিভাষিক সংজ্ঞায় যাহাকে বলা হয় "সর্বতন্ত্র-সিদ্ধান্ত"। ভট্টনায়ক ভোগীকরণের ক্ষেত্রে রজঃ ও তমোগুণের অভিভব ও সত্ত্বোদ্রেকজনিত নৈর্মল্য ও সুখাভিব্যক্তি স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার মতবাদ সাংখ্যসিদ্ধান্তের বিপরীতগামী। সাংখ্যমতে সুখ জড় চিত্তের ধর্ম, চৈতন্য বা পুরুষের ধর্ম নহে; কিন্তু ভট্টনায়কের মতবাদ সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব যে, রসচর্বণাজনিত আনন্দ সচ্চিদানন্দময় আত্মচৈতন্যেরই স্বরূপ। সাংখ্যদর্শনই যদি আচার্য ভট্টনায়কের উপজীব্য হইত, তবে রসানুভূতি সুখ ও দুঃখ উভয়াত্মক হইত,[১] কিন্তু আমরা দেখিলাম ভট্টনায়কের রসচর্বণার মধ্যে দুঃখের লেশমাত্র নাই, উহা ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর পরিপূর্ণ আনন্দের আস্বাদ। সুতরাং ভুক্তিবাদ এবং সাংখ্যীয় সিদ্ধান্তের মধ্যে এইরূপ গূঢ় ভেদ বর্তমান থাকিতে আমরা কিরূপে ভট্টনায়ককে সাংখ্যমতানুসারী বলিয়া কল্পনা করিব?[২]

---

১. "যেন ত্বভ্যধায়ি—সুখদুঃখজননশক্তিযুক্তা বিষয়সামগ্রী বাহ্যৈব। সাংখ্যদৃশা সুখদুঃখস্বভাবো রসঃ......"—অভিনবভারতী, ১ম ভাগ, পৃ. ২৭৮। সত্যসত্যই রসানুভূতির স্থলে দুঃখের অনুভূতি সম্ভব কিনা, ইহা স্বতন্ত্র বিচার সাপেক্ষ। 'নাট্যদর্পণ'কার রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র রসানুভূতির এই দ্বৈধ স্বরূপ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

২. প্রসিদ্ধ দার্শনিক অধ্যাপক Hiriyanna এই সকল ভেদ লক্ষ্য না করিয়াই 'কাব্যপ্রদীপ'-কারের পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্যের দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া ভট্টনায়কের 'ভুক্তিবাদ'কে সাংখ্যসিদ্ধান্তানুসারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। দ্রষ্টব্য: "I have stated that in not a few systems of philosophy, there was a deliberate application of fundamental principles to the interpretation of *Rasa*. The distinctive doctrines of more than one

সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, আচার্য ভট্টনায়কের 'ভুক্তিবাদ' কাশ্মীরীয় প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং শারদাতনয় তাঁহার 'ভাবপ্রকাশ' গ্রন্থে ইহা সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং আমরা তদনুসারেই ভট্টনায়কের 'ভুক্তিবাদে'র ব্যাখ্যা দিয়াছি। কাশ্মীর প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের প্রধান কেন্দ্র এবং কাশ্মীরই আচার্য ভট্টনায়কের জন্মভূমি। অভিনবগুপ্ত, কুন্তকাচার্য, মহিমভট্ট প্রভৃতি প্রাচীন সমস্ত কাশ্মীরীয় আলঙ্কারিকই প্রত্যভিজ্ঞাপ্রস্থানের দার্শনিক ছিলেন—ইহা তাঁহাদের গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোক প্রভৃতি আলোচনা করিলে বুঝা যায়। ভট্টনায়কও যে প্রত্যভিজ্ঞাবাদী দার্শনিক ছিলেন, ইহা তাঁহার রসসূত্রের ব্যাখ্যার ভাষা ও শৈলী হইতেই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়া থাকে। 'সংবিদ্‌বিশ্রান্তি', 'আনন্দঘন', 'উল্লাস' প্রভৃতি শব্দ প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের বিশিষ্ট সম্পদ, এবং ভট্টনায়ক তাঁহার রসসূত্রের ভাষ্যে প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনসম্মত এইরূপ বহু শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহাতেও যদি কাহারও সন্দেহ থাকে, তবে আচার্য অভিনবগুপ্ত তাঁহার 'অভিনবভারতী'তে ভট্টনায়ক-রচিত যে মঙ্গলাচরণ-শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন, সেইটি আলোচনা করিতে অনুরোধ করি :

"নমস্ত্রৈলোক্যনির্মাণকবয়ে শম্ভবে যতঃ।
প্রতিক্ষণং জগন্নাট্যপ্রয়োগরসিকো জনঃ ॥"

ইহার সহিত শৈবপ্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের অন্যতম প্রধান আচার্য উৎপলদেবের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি তুলনা করিয়া দেখিলে ভট্টনায়কের দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে আর কোনও সংশয় অবশিষ্ট থাকে কি ?—

---

system are found mentioned in Sanskrit works on Poetics. As an illustration of them, I shall take up the theory of *Rasa* associated with the name of *Bhattanayaka* and show how it is identical with the Samkhya theory......"—*Indian Aesthetics*: Proceedings and Transactions of the First Oriental Conference, Poona, 1919, পৃ. ২৪৬।

নিরুপাদানসম্ভারমভিত্তাবেব তন্বতে।
জগচ্চিত্রং নমস্তস্মৈ কলাশ্লাঘ্যায় শূলিনে ॥

এই শম্ভু, শূলী বা পরমশিব বেদান্তদর্শনের আত্মচৈতন্যেরই নামান্তর। কিন্তু বেদান্ত-দর্শনের সহিত প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের প্রধানতম বৈলক্ষণ্য হইতেছে, এই আত্মতত্ত্বের স্বরূপ লইয়া। বেদান্তমতে আত্মা নিঃসঙ্গ, নিষ্ক্রিয়, বাহ্যপ্রপঞ্চের সহিত সংস্পর্শ-বিরহিত; কিন্তু প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনে চৈতন্য সতত পরিস্পন্দশীল, উল্লাসময়, প্রপঞ্চের সৃষ্টিই আত্মার নিয়ত লীলা। বেদান্তমতে আত্মা উদাসীন, প্রত্যভিজ্ঞামতে আত্মার সহিত জগৎসৃষ্টিক্রিয়া সতত বিজড়িত। বেদান্তমতে জগৎ মায়াময়, মিথ্যা; প্রত্যভিজ্ঞামতে চৈতন্য ও প্রপঞ্চের সত্তা সমান্তরাল, সহভাবী, অবিচ্ছেদ্য। বেদান্তমতে অহংতা ত্রিগুণাত্মক জড়চিত্তের ধর্ম, শৈবপ্রত্যভিজ্ঞাদর্শনে আত্মচৈতন্যের প্রকাশের মধ্যেই "পরিপূর্ণ" অহংতার স্ফুরণ বর্তমান, অহংতা চৈতন্যের ধর্ম, জড়ের নহে। বেদান্তমতে অহংতার বিলোপেই আত্মতত্ত্বলাভ সম্ভব, শৈবপ্রত্যভিজ্ঞাবাদিগণের মতে খণ্ডিত অহংতা বিলুপ্ত করিয়া পরিপূর্ণ অহংতাবোধ জাগ্রত করিয়া তোলাই মুমুক্ষু যোগীর প্রধানতম লক্ষ্য। আর সব বিষয়ে বেদান্ত ও শৈবপ্রত্যভিজ্ঞা-প্রস্থানের মধ্যে কোনও লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য নাই। খণ্ডিত সত্তা, খণ্ডিত জ্ঞান, খণ্ডিত আনন্দের বোধ শুধু চৈতন্যের আবরক অজ্ঞানেরই বিচিত্র লীলা, বেদান্তমতে এই অজ্ঞানেরই অপর নাম 'অবিদ্যা', শৈবপ্রত্যভিজ্ঞামতে 'মল'। সত্ত্বের উদ্রেকের ফলে এই অবিদ্যা, অথবা মল অপসারিত হইয়া আত্মার পরিপূর্ণ প্রকাশানন্দময় স্বরূপ অনাবৃত হইয়া পড়ে—তাহাই মুক্তি। কাব্যেরও তাহাই লক্ষ্য। বেদান্ত ও প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের মতবাদের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠ সাম্যবশতই পরবর্তী আলঙ্কারিকগণ প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত আচার্য অভিনবগুপ্তের রসসিদ্ধান্তকে—যাহা 'অভিব্যক্তিবাদ'রূপে সাহিত্যমীমাংসাক্ষেত্রে পরিচিত, বেদান্তদর্শনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা 'অভিব্যক্তি-বাদে'র আলোচনাপ্রসঙ্গে সেই মতবাদের পরীক্ষা করিব।

৬ অভিনবগুপ্ত : অভিব্যক্তিবাদ

"সর্বস্বং হি রসস্যাত্র গুপ্তপাদা বিজানতে"—মাণিক্যচন্দ্র সূরি

আমরা ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদের স্বরূপ আলোচনা করিয়াছি। পরিশেষে, অভিনবগুপ্তাচার্যের রসসিদ্ধান্ত বর্ণনা করিব। আচার্য অভিনবগুপ্তের মতবাদ আলঙ্কারিক সম্প্রদায়ে "অভিব্যক্তিবাদ" বলিয়া পরিচিত। ইহাই রসচর্বণার শেষ কথা। অভিনবগুপ্তই রসতত্ত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মীমাংসক। পূর্ববর্তী ভাষ্যকারগণের মতবাদের যে সকল অনুভববিরুদ্ধ অযৌক্তিকতা, সে সকল পরিত্যাগপূর্বক আচার্য অভিনবগুপ্ত তাঁহার পূর্বাচার্যগণের সিদ্ধান্তসমূহের অন্তর্নিহিত সারতত্ত্বসকল সঙ্কলন করিয়া স্বকীয় সিদ্ধান্ত 'অভিব্যক্তিবাদে'র ভিত্তি ও সৌধ রচনা করিয়াছেন। সুতরাং তিনি যে ভারতীয় রসসূত্রের ব্যাখ্যার জন্য পূর্বগামী আচার্যগণের নিকট অনেক পরিমাণে ঋণী, এ কথা তিনি নিজেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। পূর্বগামী মনীষিগণের পরিকল্পিত 'বিবেকসোপানপরম্পরা'র সংস্কার সাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য—পূর্বাচার্যগণের দূষণোদ্ভাবন তাঁহার লক্ষ্য নহে।[১]

"ভুক্তিবাদে"র বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি—ভট্টনায়ক কাব্য এবং নাট্য উভয় ক্ষেত্রে তিনটি বিশিষ্ট শক্তি কল্পনা করিয়াছেন—অভিধা, ভাবনা এবং ভোগীকৃতি। প্রথমটি শব্দগত, দ্বিতীয়টি অর্থগত, তৃতীয়টি সহৃদয় শ্রোতা বা দর্শকের মানসব্যাপার। আচার্য অভিনবগুপ্ত ভট্টনায়ককর্তৃক কল্পিত 'ভাবনা' এবং 'ভোগীকরণ'—এই শক্তিদ্বয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ

---

১. "ঊর্ধ্বোর্ধ্বমারুহ্য যদর্থতত্ত্বং ধীঃ পশ্যতি শ্রান্তিমবেদয়ন্তী।
অলং তদাদ্যৈঃ পরিকল্পিতানাং বিবেকসোপানপরম্পরাণাম্॥"
... ...
"তস্মাৎ সতামত্র ন দূষিতানি মতানি তান্যেব তু শোধিতানি।
পূর্বপ্রতিষ্ঠাপিতযোজনাসু মূলপ্রতিষ্ঠাফলমামনন্তি॥"—অভিনবগুপ্তাচার্যকৃত 'অভিব্যক্তিবাদে'র অবতরণিকা: অভিনবভারতী, ১ম ভাগ, পৃ. ২৮০

করিয়াছেন। শব্দের অভিধা এবং অর্থের লক্ষণা—এই দুইটি মাত্র ব্যাপার বা function-ই কাব্যজ্ঞসমাজে পরিচিত। এতদতিরিক্ত 'ভাবনা'—যাহাকে ভট্টনায়ক 'সাধারণীকৃতি' বা universalisation বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং 'ভোগীকৃতি'—এইরূপ অপূর্ব শক্তিদ্বয়ের অস্তিত্ব তো সাধারণের অগোচর। 'ভোগীকৃতি' তো একপ্রকার প্রতীতি। তবে তাহার অপূর্ব নামকরণে কি ফল? আর কাব্যবর্ণিত অর্থের সাধারণীকরণের উদ্দেশ্যে ভট্টনায়ক যে ভাবনাখ্য ব্যাপার স্বীকার করিয়াছেন—ঐরূপ ব্যাপার স্বীকার করিবারই বা কি এমন প্রয়োজন, যদি অন্য প্রকারে সাধারণীকরণ সম্ভবপর হইতে পারে? সুতরাং ভট্টনায়কের সিদ্ধান্ত গৌরবদোষদুষ্ট ও নানারূপ অপূর্ব শক্তি কল্পনার ফলে যুক্তির দিক দিয়া দুর্বল। ইহা ছাড়া আরও একটি বিষয়ে ভট্টনায়কের মতবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করা যাইতে পারে। আমরা দেখিয়াছি, ভট্টনায়কের মতে বিভাব এবং অনুভাবসমূহ যেমন আপন আপন বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করিয়া দেশকালানিয়ন্ত্রিত সাধারণীকৃত রূপে সামাজিকের চক্ষে প্রতিভাত হইয়া থাকে, সেইরূপ রতি প্রভৃতি আন্তরভাবসমূহও যাহা নায়কেরই একান্ত নিজস্ব, তাহাও কাব্য ও নাট্যের 'ভাবনা' ব্যাপারের মহিমাবশে অনুরূপভাবে সাধারণীকৃত হইয়া সহৃদয় শ্রোতা ও দর্শকের চিত্তে সংক্রামিত হয়। ইহাকেই বলা হয় 'হৃদয়সংবাদ'। সুতরাং শ্রোতা বা দর্শকের স্বকীয় কোনও স্থায়িভাবের বাস্তব সত্তার অপেক্ষা নাই। আমার রতিরূপ স্থায়িভাবের সংস্কার বা বাসনা (impression) না থাকিলেও কোনও ক্ষতিই নাই। তথাপি আমি দুষ্মন্তগত শকুন্তলাবিষয়ক রতিভাবের সাধারণীকৃত রূপের উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব, কোনও বাধাই থাকিবে না। ভট্টনায়কের মতবাদের ইহাই দুর্বলতা। শৃঙ্গার প্রভৃতি সাহিত্যিক রসানুভূতি যদি সহৃদয় শ্রোতা ও প্রেক্ষকের অন্তর্নিগূঢ় রতি প্রভৃতি তত্তৎ স্থায়িভাবের মৌলিক সত্তাকে অপেক্ষা না করে, যদি উহা সম্পূর্ণভাবে সহৃদয়ের আন্তরবাসনা নিরপেক্ষ হইয়া দাঁড়ায়, তবে যে কোনও ব্যক্তি যে কোনও রসের উপলব্ধি

করিতে সমর্থ হইবে। একজন জরন্মীমাংসক—যিনি জীবনেও যৌনরতির আস্বাদ অনুভব করেন নাই, যিনি আজীবন শুষ্ক বেদাধ্যয়ন ও বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা লৌকিক সকল আসক্তি উন্মূলিত করিবার জন্য তৎপর, তিনিও দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রণয়কাহিনী দর্শনে তুল্যভাবে শৃঙ্গাররসের আস্বাদন করিবেন! কিন্তু তাহা তো হয় না। রতিবাসনাহীন ব্যক্তির নিকট প্রণয়ের মধ্যেও কোনও রস নাই, মাধুর্য নাই। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, কোনও একটি বিশিষ্ট রসের অনুভূতির প্রতি সেই রসের অনুরূপ স্থায়িভাবের বাস্তব সত্তা নিয়ত অপেক্ষিত। নতুবা, রসানুভূতি নিতান্ত অসম্ভব। যাহাদের চিত্তে রতিভাবের বাস্তব সংস্কার বিদ্যমান নাই, সেই সকল প্রেক্ষক রঙ্গালয়ের কাষ্ঠ, কুড্য, অশ্মখণ্ডের মতই শৃঙ্গাররসানুভূতি বিষয়ে চেতনাহীন, জড়। অভিনবগুপ্তের এই মতবাদের ফলে রসচর্বণা অবাস্তব কাল্পনিকতার রাজ্য হইতে বাস্তব কার্যকারণতত্ত্বের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। রসতত্ত্বের কেন্দ্রস্থানীয় ব্যক্তি সহৃদয় সামাজিক, ইহা আমরা বারংবার উল্লেখ করিয়াছি। অতএব ভরতাচার্যের রসসূত্রের ব্যাখ্যাও সেই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই করিতে হইবে। বিভাব, অনুভাব, স্থায়িভাব, সঞ্চারিভাব—রসচর্বণার যত কিছু উপাদান বা কারণকলাপ, সে সকলেরই সমবায় সহৃদয়ের চিত্তে,—কেন না, সহৃদয়েই রসানুভূতির উদ্রেক ঘটিয়া থাকে। সুতরাং কার্য ও কারণের একাশ্রয়তা বজায় রাখিতে হইলে, রসানুভূতির কার্যকারণতত্ত্ব বজায় রাখিতে হইলে, বিভাব প্রভৃতি কারণ ও রসাস্বাদরূপ কার্যের আধারের অভিন্নতা যাহাতে সংরক্ষিত থাকে, সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে—ইহাই দার্শনিক যুক্তিসঙ্গত। কার্যকারণতত্ত্বের এই মূল নিয়ম, 'সামানাধিকরণ্য' (co-inherence), রসাস্বাদের স্থলে কি করিয়া অব্যাহত রাখা যায়? 'রসাস্বাদ'—আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি,—সহৃদয় সামাজিকের আন্তর অনুভব-বিশেষ বা subjective feeling। কিন্তু রসানুভূতির যে সকল কারণ আমরা পরিগণন করিয়াছি,—বিভাব, অনুভাব, স্থায়িভাব এবং সঞ্চারিভাব,—তাহাদের

মধ্যে প্রথম দুইটি বাহ্য বা objective, কেন না, উহারা সহৃদয় চিত্তের বহির্ভূত, পরিচ্ছিন্ন দেশকালের পরিধির মধ্যে আবদ্ধ। বাহ্য ও আন্তর বস্তুর সামানাধিকরণ্য বা co-inherence কিরূপে সম্ভব? সুতরাং রসানুভূতিরূপ কার্যের উৎপত্তি নিরূপণ করিতে হইলে প্রথমেই বাহ্য বিভাবাদির সহিত তাহার একাশ্রয়ত্ব প্রমাণ করিতে হইবে।

এই সামানাধিকরণ্য স্থাপন করিতে গিয়া আচার্য অভিনবগুপ্ত বৌদ্ধ যোগাচার-সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতবাদ 'বিজ্ঞানবাদ' (idealism) আশ্রয় করিয়াছেন। যোগাচারমতে সমস্তই সংবিৎস্বভাব বা জ্ঞানাত্মক। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ, যাহাকে দ্রষ্টা স্বকীয়জ্ঞানের বিষয় বলিয়া স্বকীয় চিত্তবৃত্তির বহির্ভূত দেশকালপরিচ্ছিন্ন পৃথক্ ভাবপদার্থরূপে প্রত্যক্ষ করিতেছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে তাহারই চিত্তসন্তানমাত্র। আন্তরজ্ঞানকেই সে ভ্রমবশত বাহ্যদেশ-কালনিয়মিত সত্তার দ্বারা বিশেষিত করিয়া দেখিতেছে মাত্র। য়ুরোপীয় মনীষী বার্কলি (Berkeley) এই দার্শনিক প্রস্থানের প্রধান আচার্য। তাঁহার মতে কোনও বস্তুর সত্তা বলিতে শুধু তদ্বিষয়ক জ্ঞানমাত্রই বুঝায়,—জ্ঞাননিরপেক্ষ বস্তুর বাহ্যসত্তা সর্বতোভাবে কল্পনার অতীত। "Esse ist percipi"—"to be is to be perceived"—এই মতবাদ যদি মানিয়া লওয়া যায়, তবে সহৃদয়ের নিকট নটকর্তৃক অনুক্রিয়মাণ বিভাব-অনুভাব প্রভৃতি নাট্যোপযোগী অর্থ আপাতদৃষ্টিতে যদিও জড়, বাহ্য ও জ্ঞাননিরপেক্ষ সত্তাবিশিষ্ট, তথাপি তত্ত্বদৃষ্টিতে তাহারা সহৃদয়েরই চিত্তসন্তান—আন্তর পদার্থকে বাহ্যরূপে পরিকল্পনা করা হইয়াছে মাত্র (ইংরেজীতে ইহাকে বলা হয়—hypostatisation)—"যদন্তর্জ্ঞেয়তত্ত্বং তদ্ বহির্বদবভাসতে"। রস যেরূপ সহৃদয়ের স্বকীয় অসাধারণ অনুভূতিবিশেষ, সেইরূপ তাহার কারণসমূহও দার্শনিক বিচারদৃষ্টিতে সমানভাবেই জ্ঞানস্বভাব। সুতরাং যেহেতু রসরূপ কার্য ও বিভাবাদিরূপ কারণের একই সহৃদয়ের চিত্তে সমাবেশ হইয়া থাকে, অতএব

কার্যকারণের সামানাধিকরণ্যের কোনও ব্যতিক্রমই রসানুভূতির স্থলে আশঙ্কা করা যায় না।[১]

প্রকারান্তরেও রসানুভূতি ও বিভাবাদি কারণের একাশ্রয়তা রক্ষা করা যাইতে পারে—বৈয়াকরণ দার্শনিকগণের সাকার শাব্দবিজ্ঞানবাদ আশ্রয় করিয়া। ধনিক, রুয্যক প্রভৃতি পরবর্তী অনেক সাহিত্যমীমাংসক তাহাই করিয়াছেন। 'বাক্যপদীয়'-রচয়িতা আচার্য ভর্তৃহরি বলেন যে, শব্দের এমনই মহিমা যে তাহা শুনিলেই যুগপৎ চিত্তপটে অর্থের চিত্রটি অঙ্কিত হইয়া যায়। 'কংসবধ' প্রভৃতি পৌরাণিক আখ্যায়িকার সৌভিকগণকর্তৃক অভিনয়ের কালে যেমন নাটকীয় বস্তুবিষয়ে প্রেক্ষকের প্রত্যক্ষ চাক্ষুষ জ্ঞান জন্মে,—'এই ব্যক্তি কংস', 'এই ব্যক্তি কৃষ্ণ', 'কৃষ্ণকর্তৃক কংস নিহত হইতেছে',—সেইরূপ কংসবধ বিষয়ক কাব্য-পাঠকালেও কংস প্রভৃতি শব্দ আপন অলৌকিক বিচিত্র মহিমাবশে অভিনয়ের সাহায্য ব্যতিরেকেও সহৃদয় পাঠকের চিত্তমুকুরে আপন আপন অর্থের প্রতিবিম্ব সংক্রান্ত করিয়া দিতে পারে।[২] সহৃদয়ের নিকট নাট্যাভিনীত অর্থ যেরূপ প্রত্যক্ষ, কাব্যবর্ণিত কাহিনীও সেইরূপই প্রত্যক্ষ। তফাত শুধু এইটুকু যে, প্রথমটি ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যক্ষ, দ্বিতীয়টি শাব্দ। সহৃদয় পাঠকের নিকট বাহ্য অভিনয়ের খুব বেশি আবশ্যকতা নাই, শব্দশ্রবণেই তাহার চিত্ত-রঙ্গমঞ্চে শব্দোপনীত পদার্থসমূহের মানস-অভিনয় চলিতে থাকে। 'শকুন্তলা' পাঠ করিতে করিতেই সে মানসচক্ষে মহর্ষি কণ্বের তপোবনের শান্ত পরিবেশ, দুষ্মন্তের রাজসভার ঐশ্বর্যপূর্ণ সাজসজ্জা, স্বর্গের মারীচতপোবনে বিরহক্লিষ্টা শকুন্তলার পাণ্ডুর দেহযষ্টি প্রত্যক্ষ করিতে পারে। এই যে মানসচিত্রপরম্পরা একটির পর একটি ভাসিয়া উঠিতেছে—

---

১. অভিনবভারতী, ১ম ভাগ, পৃ. ৩৪৩-৪৪।

২. 'শব্দোপহিতরূপাংস্তান্ বুদ্ধের্বিষয়তাং গতান্।
প্রত্যক্ষমেব কংসাদীন্ সাধনত্বেন মন্যতে।'—বাক্যপদীয়

ইহার কারণ কি? শব্দ, কেবলমাত্র শব্দ,—আর কিছুই নহে। সুতরাং সহৃদয়ের রসানুভূতির প্রতি যে শকুন্তলাদি বিভাব কারণরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে তাহারা তো সম্পূর্ণরূপে তাহারই আন্তর সৃষ্টিমাত্র! নাট্যরঙ্গমঞ্চের পরিদৃশ্যমান অনুকর্তা নট প্রভৃতিকে বিভাব বলিয়া লাভ কি? অতএব বাস্তবদৃষ্টিতে বিভাব প্রভৃতি সমস্তই সহৃদয়ের চিত্তে শব্দোপনীত মানস পদার্থ মাত্র—বাহ্য জড় পদার্থ নহে। সুতরাং রসও যখন সহৃদয়ের মানস অনুভূতি, বিভাব প্রভৃতিও যখন সহৃদয়েরই সাকার বিজ্ঞানমাত্র, তখন উভয়ের মধ্যে কার্যকারণভাবের ব্যাঘাত কি করিয়া থাকিতে পারে?

কিন্তু এ তো গেল শব্দময় কাব্যের ক্ষেত্রে। পদার্থাভিনয়াকত্মক নাট্যস্থলে বিভাব, অনুভাব প্রভৃতির সহিত আন্তর রসানুভূতির একাশ্রয়তা কিরূপে রক্ষিত হইবে? সেখানে তো আলম্বনবিভাব, উদ্দীপনবিভাব প্রভৃতি সমস্তই বাহ্যবস্তু! দুষ্যন্ত, শকুন্তলা, কণ্বের তপোবনে মাধবীলতার বিবিক্তমণ্ডপ,—নাট্যের যত কিছু উপকরণ সকলই তো দর্শকচিত্তের বহির্ভূত? জগন্নাথ তাঁহার 'রসগঙ্গাধর' গ্রন্থে অভিনবগুপ্তপাদের ব্যক্তিবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, স্বপ্নদৃষ্ট রথ তুরগ প্রভৃতি উপকরণ যেমন আত্মচৈতন্যেরই অবিদ্যার বিলাসমাত্র, তাহাদের যেমন স্বতন্ত্র বাহ্য কোনও সত্তা নাই, কিংবা শুক্তিতে রজতভ্রান্তি যেমন বাস্তব রজতসংস্পর্শবিহীন, আত্মাশ্রিত অবিদ্যারই পরিণাম মাত্র, সেইরূপ নাট্যাভিনীত বিভাব, অনুভাব প্রভৃতি বিচিত্র পদার্থসমূহও স্বপ্নদৃষ্টপদার্থের মত, অথবা ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ীভূত রজতাদি বস্তুর মতই বাহ্যসত্তাশূন্য বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। বাহ্য ঘটাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষের জন্য যেমন চক্ষু প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্যের অপেক্ষা করে, নাট্যাভিনীত পদার্থ প্রত্যক্ষের জন্য বহিরিন্দ্রিয়ের সেইরূপ সাহায্য অপেক্ষিত নহে। উহারা যেন স্বপ্নদৃষ্টপদার্থের মত, অথবা ভ্রান্তরজতাদির মত ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ প্রত্যক্ষবিশেষ। ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ আত্মচৈতন্যই উহাদের প্রকাশক,

উহারা 'সাক্ষিভাস্য'—'বৃত্তিভাস্য' নহে।[১] সুতরাং রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব যেমন সহৃদয়ের আন্তরধর্ম, সেইরূপ বিভাব প্রভৃতি নাট্যের উপাদান—যাহারা সাধারণদৃষ্টিতে বাহ্যপদার্থরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে, তাহারাও তত্ত্বদৃষ্টিতে অনুরূপভাবে সহৃদয়েরই আন্তরভাব মাত্র।

প্রশ্ন হইতে পারে: বিভাব, অনুভাব প্রভৃতি যদি সহৃদয়ের আন্তর ধর্মই হয়, এবং রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবের সহিত যদি তাহাদের সহৃদয়চিত্তে সমাবেশ বাস্তব হয়, তবে 'রসানুভূতি'র এই ক্বাচিৎকতা (occasionality) কেন? আমি কেন সর্বদাই রসাস্বাদ করি না? উহার জন্য বিশিষ্ট দেশ এবং কালের অপেক্ষা কি জন্য? উত্তরে বলা হয়: আমাদের চৈতন্যের তিনটি অংশ (aspect) আছে—(১) সদংশ—যাহার ফলে 'আমি আছি' এইরূপ প্রতীতি হয়; (২) চিদংশ—যাহার ফলে 'আমি জানি' এইরূপ বোধ জন্মিয়া থাকে; এবং (৩) আনন্দাংশ—যাহার স্ফুরণের ফলে 'আমি সুখী' 'আমি আনন্দ অনুভব করিতেছি' এইরূপ প্রতীতি সম্ভবপর হয়। এই প্রত্যেকটি অংশেরই এক একটি আবরক অজ্ঞান (nescience) আছে। উহার কার্য শুধু চৈতন্যের কোনও অংশবিশেষের স্ফুরণ আবৃত করিয়া রাখা। সদংশের আবরক অজ্ঞানকে বলা হয়—'অসত্তাপাদক' অজ্ঞান, কেন না, ইহার ফলে আমার প্রকৃত সত্তা চাপা পড়িয়া যায়, আমি আমার স্বকীয় অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দিহান হইয়া পড়ি। চিদংশের আবরক অজ্ঞানকে বলা হয় 'অভানাপাদক' অজ্ঞান। ইহা আত্মার বিজ্ঞানাংশকে আবৃত করিয়া রাখে। বিভিন্ন বিষয়ের সহিত বিজ্ঞানাংশের সংস্পর্শের ফলেই সেই সেই বিষয় সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কিন্তু অভানাপাদক অজ্ঞান আমাদের চৈতন্যের বিজ্ঞানাংশ ও জ্ঞানের বিষয়—ঘট, পট প্রভৃতির মধ্যে একটি ব্যবধান রচনা করে, একটি পর্দা ফেলিয়া

---

১. 'বিভাবাদীনামপি স্বপ্নতুরগাদীনামিব রঙ্গরজতাদীনামিব সাক্ষিভাস্যত্বমবিরুদ্ধম্'—রসগঙ্গাধর, পৃ. ২৬।

দেয়। বাহ্যবস্তুর সহিত বিজ্ঞানাংশের সম্পর্ক তখন খণ্ডিত হইয়া যায়। তখন আমরা বলি, 'আমি ঘট জানি না,' 'আমি পট জানি না,' 'আমি ইহা জানি না', 'আমি উহা জানি না'। তৃতীয়, আনন্দাংশের আবরক যে অজ্ঞান, উহা 'অনানন্দাপাদক' অজ্ঞানরূপে পরিচিত। উহার কার্য আত্মার নির্মল আনন্দরূপকে ঢাকিয়া দেওয়া। এই আনন্দরূপের সহিত বাহ্য বিষয়ের সম্বন্ধ বশতই আমরা সেই সেই বিষয় উপভোগের মধ্যে সুখের সন্ধান পাই। বস্তুত বাহ্য বিষয়ের কোনও স্বকীয় আনন্দরূপ নাই, আনন্দ কেবল আত্মচৈতন্যেরই অসাধারণ ধর্ম। পুত্র, কলত্র প্রভৃতি যে আমাদের প্রিয়, সে কেবল আমার আত্মা প্রিয় বলিয়া। চন্দনানুলেপন যে আমাদের সুখহেতু, সে শুধু আমার আত্মা সুখস্বভাব বলিয়া। যখন এই আনন্দাংশ অজ্ঞানের আবরণে অপ্রকাশিত থাকে, তখন আত্মার আনন্দরূপ স্ফুরিত হয় না। তখন সকলই দুঃখ, সকলই নিরানন্দ, সকলই অপ্রিয় তখন 'আমি সুখী' এইরূপ প্রতীতি হয় না, 'আমি দুঃখী' এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে। কিন্তু সুখস্বভাব, আনন্দস্বভাব আত্মচৈতন্যে দুঃখ ও নিরানন্দের আরোপ কখনই বাস্তব হইতে পারে না, উহা ভ্রম মাত্র, এবং সেই ভ্রমের মূলে আছে অবিদ্যা—যাহা আনন্দাংশের স্বাভাবিক স্ফুরণকে ব্যাহত করিতেছে। এই আনন্দের আবরক অজ্ঞান যখন অপগত হয় তখন আত্মার প্রিয়রূপ আপন পরিপূর্ণ মহিমায় প্রকাশ পায়। কবিকর্মের—তাহা কাব্যই হউক, নাট্যই হউক, চিত্রই হউক, অথবা ভাস্কর্যই হইক (আমরা এখানে 'কবি' শব্দের ব্যাপক অর্থ ধরিতেছি, ইংরেজীতে যাহাকে creative artist বলা হইয়া থাকে), তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য সহৃদয়ের আত্মচৈতন্যের এই আনন্দাবরক অজ্ঞানের অপসারণ, যাহাকে দার্শনিক পরিভাষায় বলিতে পারা যায় 'আবরণভঙ্গ'। আনন্দস্বরূপ আত্মার অভিব্যক্তিসাধনই সাহিত্যের চরম লক্ষ্য, এবং যে ব্যাপারবশে আত্মার আনন্দাংশের এই আবরণভঙ্গ সম্ভবপর হয়, তাহাকে ধ্বনিবাদিগণ 'ব্যঞ্জনাব্যাপার' (function

of suggestion) বলিয়া থাকেন। সাহিত্যবর্ণিত বিভাব, অনুভাব প্রভৃতি অর্থেরই এই অসাধারণ ব্যাপার আছে, লৌকিক অর্থের নহে।[১]

দেখা গেল, অভিনবগুপ্তের মতে রসানুভূতি শুধু সংবেদনঘন চৈতন্যের আনন্দাংশের আবরণভঙ্গমাত্র। কাব্যবর্ণিত অথবা নাট্যাভিনীত বিভাবাদি অর্থের ব্যঞ্জনাব্যাপারের অলৌকিক মহিমাবশে এই আবরণভঙ্গ সম্ভব হয়। ফলে বিশুদ্ধ নিঃসঙ্গ আত্মচৈতন্যের যে স্ববিশ্রান্ত স্ফুরণ তাহার মধ্যে সংবেদন এবং আস্বাদ—cognition এবং affection, consciousness এবং feeling, দুইই সমানভাবে বর্তমান। আমাদের আনন্দানুভূতির মধ্যেও বিজ্ঞানাংশের স্ফুরণ অব্যাহত থাকে। আমাদের রসানুভূতি 'বিজ্ঞানময় আনন্দানুভূতি', বিজ্ঞান ও আনন্দময় চৈতন্যের আবরণহীন জ্যোতির্ময় প্রকাশ। সেইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি।"

কিন্তু স্বয়ম্প্রকাশ আবরণহীন চৈতন্যই যদি রসপদবাচ্য হয়, তবে ভরতের রসসূত্রের সঙ্গতি রহিল কোথায়? ভরত যে বলিয়াছেন—'অথ স্থায়িভাবান্ রসত্বমুপনেষ্যামঃ'—তাহা রক্ষিত হইল কই? রস তো স্থায়িভাবের পরিণাম নহে, উহা তো চৈতন্যস্বরূপ? অভিনবগুপ্তাচার্য এই প্রশ্নের সমাধান নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন: সংবেদনঘন আত্মচৈতন্যের আনন্দানুভূতিই রসাস্বাদ। তথাপি স্থায়িভাবসমূহ সেই আনন্দানুভূতিকে চিত্রীকৃত (variegated) করিয়া তুলে। রতি, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ প্রভৃতি স্থায়িভাবের উপযোগিতা আর কিছুই নহে, 'চিত্রতাকরণ' মাত্র। চৈতন্য এক ও অভিন্ন, উহার আনন্দস্বরূপেরও কোনও ভেদ বাস্তবদৃষ্টিতে সম্ভব নহে। তথাপি শৃঙ্গার, করুণ, রৌদ্র, বীর প্রভৃতি রসানুভূতি যে সহৃদয়ের চিত্তে বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে, তাহার কারণ সেই সেই স্থায়িভাব উদ্বুদ্ধ

১. "তথা চাহুঃ—'ব্যক্তঃ স তৈর্বিভাবাদ্যৈঃ স্থায়ী ভাবো রসঃ স্মৃতঃ'—ইতি। ব্যক্তো ব্যক্তিবিষয়ীকৃতঃ। ব্যক্তিশ্চ ভগ্নাবরণা চিৎ।"—রসগঙ্গাধর, পৃ. ২৬।

হইয়া অখণ্ড ও ভেদশূন্য আনন্দময় চৈতন্যের মধ্যে আপন আপন বৈচিত্র্য সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন করিয়া তুলে। স্থায়িভাবসমূহ যেন বিভিন্ন বর্ণের কতকগুলি পুষ্পকোরক, এবং বিজ্ঞান ও আনন্দময় আত্মচৈতন্য যেন স্বচ্ছ স্ফটিকখণ্ড। বিচিত্র বর্ণের পুষ্পকোরকের সান্নিধ্যে আসিয়া স্ফটিকখণ্ডটি যেমন বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত বলিয়া দর্শকের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়, সেইরূপ ভেদরহিত আনন্দস্বভাব আত্মচৈতন্যের রসস্বরূপও বিচিত্র স্থায়িভাবের সংস্পর্শে আসিয়া শৃঙ্গার, করুণ প্রভৃতি আপাতবিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। তত্ত্বদৃষ্টিতে সমস্ত রসই কিন্তু আনন্দস্বরূপ চৈতন্যের পূর্ণ প্রকাশমাত্র।[১]

১. "অস্মন্মতে হি সংবেদনমেবানন্দঘনমাস্বাদ্যতে। তত্র কা দুঃখাশঙ্কা? কেবলং তস্যৈব চিত্রতাকরণে রতিশোকাদিবাসনাব্যাপারঃ, তদুদ্বোধনে চাভিনয়াদিব্যাপারঃ।"—অভিনবভারতী, ১ম ভাগ, পৃ. ২৯৩।

কাব্য ও অলঙ্কার

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর সাহিত্যমীমাংসক ধারাধিপতি ভোজদেব মানবদেহের সহিত কাব্য বা শব্দাত্মক সাহিত্যের তুলনা করিয়া বলিয়াছেন—

"শব্দ এবং অর্থ কাব্যের শরীর, রস (ভাব) প্রভৃতি কাব্যের আত্মা, (ওজঃ শ্লেষ প্রভৃতি) গুণ শৌর্য প্রভৃতির ন্যায়, (কাব্যের) দোষ-সমূহ (মানবদেহের) কাণত্বাদির ন্যায়, রীতিসমূহ অবয়বের সন্নিবেশের সহিত তুলনীয় এবং অলঙ্কারসমূহ কটক কুণ্ডল প্রভৃতির সদৃশ।"

'কাব্যমীমাংসা'-রচয়িতা মহাকবি রাজশেখরও সারস্বতেয় 'কাব্যপুরুষে'র বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"(হে বৎস!) শব্দ এবং অর্থ তোমার শরীর। সংস্কৃত তোমার মুখ; প্রাকৃত-ভাষানির্মিত তোমার বাহুদ্বয়; তোমার জঘনদেশ অপভ্রংশভাষাময়; তোমার পদযুগল পৈশাচভাষাবিনির্মিত। তুমি সমতা, প্রসাদ, মাধুর্য এবং ওজোগুণযুক্ত। তোমার বচন উক্তিনৈপুণ্যে ভূষিত। রস তোমার আত্মস্বরূপ, তোমার রোমরাজি ছন্দোময়; অনুপ্রাস এবং উপমা প্রভৃতি তোমাকে অলঙ্কৃত করিতেছে।"

শব্দ এবং অর্থ যে সাহিত্যের দ্বৈধ শরীর তাহা পূর্ববর্ত্তী এক প্রবন্ধে সূচিত হইয়াছে।[১] কিন্তু গুণ, রীতি, অলঙ্কার, রস ইহাদের স্বরূপ কি? শব্দ এবং অর্থ হইতে ইহাদের পৃথক্‌ভাবে বিশ্লেষণ কি করিয়া সম্ভবপর? সাহিত্যমীমাংসক-সম্প্রদায় কাব্যশরীর ও রক্তমাংসগঠিত পুরুষদেহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য যত্নবান হইয়াছেন বটে; কিন্তু এই সাদৃশ্যের কোনও বাস্তব ভিত্তি আছে কি? ইহা কি false analogy নহে? পুরুষের

১. 'সাহিত্যের লক্ষণ'

চেতনা, কৃতি, ইচ্ছা প্রভৃতির দ্বারা তাহার আত্মাকে অনুমান করা সম্ভবপর ; তাহার শৌর্য, দাক্ষিণ্য, দয়া প্রভৃতি গুণ সাধারণের অনুভবগোচর ; কটক, কুণ্ডল প্রভৃতি আভরণ যে তাহার শরীরকে ভূষিত করে তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না ; তাহারা যে পুরুষদেহের সহিত অভিন্ন নহে, তাহা প্রত্যক্ষগোচর। কিন্তু শব্দার্থময় সাহিত্যের ক্ষেত্রে কি আত্মা, গুণ, অলঙ্কার প্রভৃতির সেইরূপ নিঃসন্দিগ্ধ প্রতীতি সম্ভব ? কাব্যশরীরের উপাদান শব্দ ও অর্থ হইতে তাহার আত্মা, গুণ, রীতি, অলঙ্কার প্রভৃতির পৃথক্‌করণ (abstraction) কি কাব্যমীমাংসকগণের একটা নিছক কল্পনামাত্র নহে ?

প্রথমত অলঙ্কার বিষয়েই আলোচনা করা যাউক। সাধারণ পাঠক যখন কাব্যসম্বন্ধে কোনও ধারণা করিতে যায়, তখন অলঙ্কারের কথা স্বতই তাহার বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়। দৈনন্দিন ব্যবহারজীবনের ভাষা ও সাহিত্য বা কাব্যের ভাষার মধ্যে প্রভেদ কোথায় ?—সাধারাণ পাঠককে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, অনেকেই বলিবে, অলঙ্কারে। আমাদের ব্যবহারজীবনের ভাষা 'আটপৌরে', নিরাভরণ ; শব্দকে মার্জিত করিবার, তাহাকে বিশিষ্টভাবে বিন্যস্ত করিবার দিকে আমাদের লক্ষ্যই থাকে না। ব্যবহারজীবনে আমরা যখন মাননীয় ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ-অবসরে, "মহাশয়! অনুগ্রহপূর্বক সভাস্থলে উপস্থিত হইলে বাধিত হইব" এই পর্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট সৌজন্য রক্ষিত হইল বলিয়া মনে করি, কবির লেখনী এই নিতান্ত সাধারণ আমন্ত্রণকেই কত বক্রভাবে, কত বৈদগ্ধ্যের সহিত পাত্রপাত্রীর মুখ দিয়া তাঁহার কাব্যে প্রকাশ করিয়া থাকেন! "মহাশয়! আমাদের গৃহ অনুগ্রহপূর্বক অলঙ্কৃত করিবেন কি ?" "মহাভাগের উদার আকৃতি দর্শনে আমাদের নেত্র সফল হইবে" ইত্যাদি। অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের প্রথম অঙ্কে মহারাজ দুষ্মন্তের আকস্মিক আশ্রমপ্রবেশে বিস্মিতা অনসূয়া তাঁহার পরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্য জানিবার জন্য কত বক্রোক্তিরই আশ্রয় লইয়াছে—

"আর্যের মধুর বিশ্রম্ভালাপ আমাকে (এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা বিষয়ে) মন্ত্রণা

দিতেছে যে, আর্য কোন্ রাজর্ষিবংশ অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন? কোন্ জনপদের অধিবাসিগণ মহাভাগের প্রবাসজনিত বিরহে পর্যুৎসুকহৃদয় হইয়া রহিয়াছে? কি নিমিত্তই বা আর্য এই নিরতিশয় সুকুমার আত্মাকে তপোবনপরিভ্রমণ-জনিত ক্লেশের ভাজন করিয়াছেন?"

আশ্রমকন্যা অনসূয়ার মুখে, "আর্য কোন্ দেশ হইতে আগমন করিতেছেন, কি জন্যই বা আর্যের এই তপোবনে আগমন?"—দুষ্মন্তের প্রতি এইরূপ নিরাভরণ প্রশ্ন নিতান্তই প্রাকৃতজনোচিত হইত; কালিদাস তাহাকে বক্র করিয়াছেন, তাহাতে বৈদগ্ধ্যযোজনা করিয়াছেন, যাহার ফলে উহা সাহিত্যে স্থানলাভের যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই উক্তিকৌশল, এই "বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতি," এই বক্রোক্তিই সাহিত্যিক সৌন্দর্যের নিদান। এবং সাহিত্যমীমাংসকসম্প্রদায় যে সকল উক্তিবৈচিত্র্য অলঙ্কার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, সে সকলেরই মূলে আছে 'বক্রতা' বা 'বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতি'। এই বক্রোক্তিরই অপর নাম 'অলঙ্কার'। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, অতিশয়োক্তি, সমাসোক্তি, অপ্রস্তুতপ্রশংসা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অলঙ্কার এই বক্রোক্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। বক্রোক্তিই তাহাদের প্রাণস্বরূপ। আচার্য কুন্তক তাঁহার 'বক্রোক্তি-জীবিত' গ্রন্থে স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"পদসমুদায়াত্মক বাক্যের সহস্র প্রকারে বক্রতা সম্পাদন করা যাইতে পারে এবং সেই 'বক্রতা'র মধ্যেই সকল অলঙ্কারবর্গ নিঃশেষে অন্তর্ভুক্ত হইবে।"

যেমন, 'মুখটি অতিশয় সুন্দর', এই বাক্যটিকেই 'মুখটি চন্দ্রের মত সুন্দর', 'মুখটি যেন চন্দ্র,' 'ইহা মুখ নহে, ইহা চন্দ্র,' 'এই মুখটি চন্দ্র হইতেও অধিকতর সুন্দর,' এইরূপে যথাক্রমে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, অপহ্নুতি, ব্যতিরেক প্রভৃতি অলঙ্কারের আকারে শত শত কবিজনোচিত বিদগ্ধভঙ্গীতে প্রকাশ করা যাইতে পারে। উদ্দেশ্য একই—মুখের সৌন্দর্য বর্ণনা; বাক্যবিন্যাসেই কেবলমাত্র ভেদ। অতএব এই বিন্যাসভেদ বা বক্রতাই যে অলঙ্কারের

'জীবাতু' তাহা স্পষ্টই বুঝা গেল, এবং এই বক্রোক্তিই 'লৌকিক' বাক্যসমূহকে কাব্যের পদবীতে উত্তীর্ণ করিয়া থাকে। প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের 'কাব্য' লক্ষণ পর্যালোচনা করিলে সাহিত্যক্ষেত্রে অলঙ্কারের প্রাধান্য অতি সুস্পষ্টভাবে লক্ষিত হইবে। চিরন্তন আলঙ্কারিক আচার্য ভামহ তাঁহার 'কাব্যালঙ্কার' গ্রন্থে বলিয়াছেন, "সুন্দরীর মুখচ্ছবি যতই কমনীয় হউক না কেন, ভূষাহীন হইলে কখনই তাহা শোভা পায় না।" পরবর্তীকালে বামনাচার্য তাঁহার 'কাব্যালঙ্কার-সূত্রবৃত্তি' গ্রন্থের উপক্রমেই ভামহের এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, "অলঙ্কারবশতই কাব্য সহৃদয়গণের আস্বাদনীয় হইয়া উঠে।" সাধারণ লৌকিক বুদ্ধিতে কাব্যের সহিত অলঙ্কারের সম্বন্ধ এমনই অবিচ্ছেদ্য যে, পরবর্তী একজন আলঙ্কারিক মন্তব্য করিয়াছেন—

"যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি অনলঙ্কৃত শব্দার্থ-যুগলকে কাব্যরূপে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন না, তিনি কি জন্যই বা অনলকে অনুষ্ণ বলিয়া কল্পনা করেন না?"

অভিপ্রায় এই: বহ্নিকে অনুষ্ণ বলিয়া কল্পনা করা যেরূপ অস অলঙ্কার-বিহীন শব্দার্থের কাব্যত্বকল্পনা ততোধিক অসম্ভব। অধিক কি, সাহিত্যবিচারে অলঙ্কারের এই অত্যধিক প্রাধান্যই 'সাহিত্য-মীমাংসা'-শাস্ত্রের 'অলঙ্কার-শাস্ত্র' ব্যপদেশের মূলে। সংস্কৃতসাহিত্যবিচারের যে কোনও গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রতিপাদ্য বিষয় শুধু অলঙ্কারই নয়—ধ্বনি, রীতি, গুণ, দোষ প্রভৃতির বিশ্লেষণ এবং মীমাংসাও উহার উদ্দেশ্য। কিন্তু অলঙ্কারবিচার আর সকল বিচারকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে, এবং সেইজন্যই সাহিত্যমীমাংসা-বিষয়ক গ্রন্থসমূহ সাধারণ পাঠকসমাজে 'অলঙ্কার' গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত। 'প্রাধান্যেন ব্যপদেশা ভবন্তি'।

মানবসভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসে কটক, কুণ্ডল প্রভৃতি অলঙ্কার এককালে সৌন্দর্যের অপরিহার্য উপাদান ছিল। সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের প্রাথমিক পর্যায়ে অনুপ্রাস, যমক প্রভৃতি শব্দালঙ্কার এবং উপমা, রূপক,

অতিশয়োক্তি প্রভৃতি অর্থালঙ্কারও যে কবিকর্মের অপরিহরণীয় সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হইত, ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। কেন না, সাহিত্য অনেকাংশে সমসাময়িক লৌকিক সভ্যতার প্রতিচ্ছবি, তাহার মধ্য দিয়াই সমসাময়িক মানবের সৌন্দর্যবোধ ও রুচিজ্ঞান প্রকাশিত হইয়া থাকে, ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।[১] এখনও মানবসমাজ অলঙ্কারের মোহ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারে নাই। পূর্বে যাহা স্থূল ছিল, এখন তাহাই সূক্ষ্ম হইয়াছে; যাহা গুরু ছিল, তাহা লঘু হইয়াছে; যাহা 'কুণ্ডল' ছিল, তাহা 'কর্ণিকা' হইয়াছে। "তাঁরা সবাই অন্য নামে আছেন মর্ত্যলোকে"। কাব্যালঙ্কারের ক্ষেত্রেও সেই একই রীতি। নূতন নূতন অলঙ্কার উদ্ভাবিত হইতেছে, কত সূক্ষ্ম 'বক্রোক্তি', বাক্যযোজনায় কত নূতন বৈদগ্ধ্য! এ সমস্তই কাব্যের সৌন্দর্যসাধনের জন্য। কেন না, সৌন্দর্যই অলঙ্কার।

অলঙ্কার যে সৌন্দর্যসাধনের একটি বিশিষ্ট উপাদান, তাহা কোনও সহৃদয়ই অস্বীকার করিবেন না। দোলায়িত শ্রবণকুণ্ডল যে কমনীয় রমণীমুখের সৌন্দর্য অধিকতর ঔজ্জ্বল্যমণ্ডিত করে, তাহা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিমাত্রেরই অনুভবসাক্ষিক। ভামহ, দণ্ডী প্রভৃতি প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ সাহিত্যক্ষেত্রে উপমা প্রভৃতি কাব্যালঙ্কারসমূহের যে একটি বিশিষ্ট স্থান নির্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন, ইহা তাঁহাদের রুচিবোধেরই পরিচায়ক। কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁহারা ভ্রান্ত ছিলেন। তাঁহারা অলঙ্কারকেই সাহিত্যের প্রাণস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে অলঙ্কারকে বাদ দিয়া কবিকর্মের কোনও অস্তিত্বই থাকিতে পারে না। তাঁহারা যদি উপমানভূত নারীদেহের সহিত কাব্য-শরীরের পূর্ববর্ণিত সাধর্ম্য এই স্থলে লক্ষ্য করিতেন, তাহা হইলে সম্ভবত এইরূপ প্রমাদে পড়িতেন না। কটক, কুণ্ডল প্রভৃতি অপসারিত করিলে ভূষণহীন নারীদেহের কি কোনও সৌন্দর্যই অবশিষ্ট থাকে না? সাহিত্যে

১. "লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যমেতন্ময়া কৃতম্"—নাট্যশাস্ত্র, ১.১১৩। 'নাট্য' বা 'দৃশ্যকাব্য' সম্বন্ধে এই উক্তি 'শ্রব্যকাব্য' সম্বন্ধেও অনুরূপ প্রযোজ্য।

অলঙ্কারের আত্মভাব মানিয়া লইলে, তুল্যযুক্তিতে লৌকিক নারীসৌন্দর্যেরও এইরূপ অবস্থাই দাঁড়ায় বটে। কিন্তু কোনও সৌন্দর্যরসিক ব্যক্তিই ইহা স্বীকার করিয়া লইবেন না। নারীদেহের লাবণ্য আছে—মুক্তাফলের অন্তর্গত তরল কান্তির ন্যায় যাহার প্রভা। অলঙ্কারের অপসারণের দ্বারা সেই প্রভাতরল জ্যোতিকে অপসারিত করা যায় না। তাহাই নারীসৌন্দর্যের নিদান, তাহাই সৌন্দর্যের আত্মা। কাব্যের স্থলেও অলঙ্কারচ্যুতি কাব্য-সৌন্দর্যের ব্যাঘাত করিতে পারে না। উপমা, রূপক প্রভৃতি সমস্ত অলঙ্কার শব্দার্থরূপী কাব্যশরীর হইতে সরাইয়া লইলেও প্রকৃত সাহিত্যিক কবিকর্মের সৌন্দর্যের সম্পূর্ণ বিলোপসাধন করা যায় না। এবং সমস্ত অলঙ্কার বিযুক্ত করিয়া লইলেও ভূষণহীন কাব্যশরীরের যে কান্তি আপন মহিমায় দীপ্তি পাইতে থাকে, যাহা কাব্যদেহের লাবণ্যস্বরূপ, তাহাই কাব্যবস্তুর আত্মা বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। আনন্দবর্ধনাচার্য প্রমুখ ধ্বনিবাদিগণ কাব্যের এই অন্তর্নিহিত লাবণ্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাই প্রাচীন ভামহ প্রভৃতি পূর্বাচার্যগণের অলঙ্কারের মোহ তাঁহাদের তত্ত্বদৃষ্টিকে আবৃত করিতে পারে নাই। এই লাবণ্যের অপর সংজ্ঞা 'ধ্বনি',—'বস্তুধ্বনি', 'অলঙ্কারধ্বনি', 'রসধ্বনি'। ইহাদের মধ্যে রসধ্বনিই শ্রেষ্ঠ কাব্যতত্ত্ব,—তাহা হইতেই কাব্যের উৎপত্তি, তাহাতেই স্থিতি এবং তাহাতেই পর্যবসান। সেইজন্য রসধ্বনিই তাঁহাদের মতে কাব্যের আত্মা। সেই আত্মার সন্ধান যিনি পাইয়াছেন, তিনি কি কখনও অলঙ্কারের মোহে মুগ্ধ হইতে পারেন?

এখানে অনেকেই প্রশ্ন করিবেন: 'ধ্বনিবাদিগণ কি তবে সাহিত্যক্ষেত্র হইতে উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারগুলিকে নির্বাসিত করিলেন? প্রকৃত কবিকর্ম কি তবে একেবারেই নিরলঙ্কার?'—ধ্বনিবাদের প্রবর্তক আনন্দবর্ধনাচার্য সাহিত্যিক অলঙ্কারসমূহের উপযোগিতা ও অস্তিত্ব আদৌ অস্বীকার করেন নাই। প্রাচীন সাহিত্য-মীমাংসক সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার বিরোধ শুধু তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ লইয়া। ভামহ, দণ্ডী প্রভৃতি পূর্বাচার্যগণ লৌকিক

অনলঙ্কৃত কাব্যশরীরের অস্তিত্ব তাঁহাদের মতে মানিয়া লইতে হয়। কিন্তু অলঙ্কারযোজনায় ইহাই কি অনুভবসিদ্ধ পদ্ধতি? উত্তম কাব্যের যে সকল অলঙ্কার, তাহারা কি নারীদেহের অলঙ্কারের ন্যায় কতকগুলি শিথিলবিন্যস্ত জড়-পদার্থমাত্র? যে আবেগবশে কবি তাঁহার অন্তর্নিরুদ্ধ রসধারা শব্দার্থ-যুগলের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেই একই আবেশের দ্বারা কি অলঙ্কারসমূহও জন্মলাভ করে না? তাহাদের জন্য কি কোনও পৃথক্ প্রযত্নের বা অভিনিবেশের আবশ্যকতা উত্তমকবি উপলব্ধি করিয়া থাকেন? বিচার করিয়া দেখিলে প্রাচীন আচার্যগণের মতবাদের ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়ে। 'কাব্যের অলঙ্কার' এইরূপ উক্তির দ্বারা 'কাব্য' ও 'অলঙ্কারে'র মধ্যে যে ভেদ প্রতীত হইয়া থাকে, তাহার মূলে কোনও অভ্রান্ত যুক্তি নাই, এবং তাহা সহৃদয়ের অনুভববিরুদ্ধ। উত্তমকাব্যে শব্দ ও অর্থের সহিত অলঙ্কারের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। রসাবিষ্ট কবিচিত্ত স্বগত ভাবের প্রকাশের দিকেই তন্ময়ীভূত হইয়া থাকে, শব্দ এবং অর্থ স্বতই উৎসারিত হইয়া আসে—বিচিত্র বক্রোক্তির আকারে, বিবিধ অলঙ্কারের রূপ ধরিয়া। অতএব উত্তমকাব্যের যে সকল 'বক্রোক্তি' বা 'অলঙ্কার', তাহা শব্দার্থের কোনও বাহ্য বা আগন্তুক ধর্ম নহে। উহা শব্দার্থেরই অন্তরঙ্গ বিলাস। এইরূপে, যেসকল অলঙ্কার 'অপৃথগ্‌যত্ননির্বর্ত্য' তাহারাই উত্তমকাব্যের প্রকৃত শোভার হেতু, তাহারাই প্রকৃত 'অলঙ্কার'। যমক, অনুপ্রাস প্রভৃতি শব্দালঙ্কার কাব্যদেহের সহিত এইরূপ অন্তরঙ্গভাবে সম্বদ্ধ নহে। তাহাদের উদ্ভাবনের জন্য কবির স্বতন্ত্র অভিনিবেশ আবশ্যক। রসাবিষ্ট কবিচিত্ত হইতে উহারা স্বত উৎসারিত হইয়া উঠে না। তাহা 'পৃথগ্‌যত্ননির্বর্ত্য'। এইজন্য ধ্বনিবাদের প্রবর্তক আচার্য আনন্দবর্ধন পুনঃ পুনঃ 'ধ্বনিকাব্যে' বা উত্তমকাব্যে' অনুপ্রাস প্রভৃতি বর্জন করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। প্রকৃত বক্রোক্তি বা অলঙ্কার কবির চিন্তাধারারই অন্তরঙ্গ রূপ মাত্র। কিন্তু যে সকল অলঙ্কার উদ্ভাবনের জন্য কবিচিত্তের পৃথক্ অভিনিবেশ প্রয়োজন, তাহাদের সহিত কবির

চিন্তাধারার কোনও আন্তর সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। সেইজন্য, আনন্দবর্ধনাচার্য উহাদিগকে বহিরঙ্গ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ অলঙ্কার্য ও অলঙ্কারের মধ্যে অন্তরঙ্গতার তারতম্য লক্ষ্য করিয়া লৌকিক অলঙ্কারসমূহের ত্রিবিধ শ্রেণীবিভাগ করিয়া গিয়াছেন। ধারাধিপতি ভোজদেব তাঁহার 'শৃঙ্গারপ্রকাশ' শীর্ষক আলঙ্কারিক নিবন্ধে বলিয়াছেন: "অলঙ্কারসমূহ ত্রিবিধ—বহিরঙ্গ, অন্তরঙ্গ ও মিশ্র। বহিরঙ্গের উদাহরণ যেমন বস্ত্র, মাল্য, (কটক, কেয়ুর প্রভৃতি) বিভূষণ। অন্তরঙ্গ যেমন, দন্তপরিকর্ম, নখচ্ছেদ এবং কেশবিন্যাস প্রভৃতি। মিশ্র যেমন, স্নান, ধূপ এবং (চন্দন, কুঙ্কুম প্রভৃতি) বিলেপন।"

সৌন্দর্যসম্বন্ধে যাঁহার সূক্ষ্মবোধ আছে, তিনিই উপরিউক্ত শ্রেণীবিভাগের যৌক্তিকতা স্বীকার করিবেন। বস্ত্র মাল্য কুণ্ডল অপেক্ষা স্নান, ধূপবাস, কুঙ্কুমবিরচিত পত্রলেখা অধিকতর রমণীয়; তদপেক্ষা রমণীয় নখচ্ছেদ এবং অলকরচনা। ইহারা প্রত্যেকেই যে নারীদেহের প্রসাধনের উপাদান, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু এই রমণীয়তার তারতম্য কিসের জন্য? সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিচার করিলে, অন্তরঙ্গতার তারতম্যই কি ইহার একমাত্র কারণ নহে? অলঙ্কার্য নারীদেহের সহিত যে অলঙ্কারের যত ঘনিষ্ঠ, যত অন্তরঙ্গ, যত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তাহার সৌন্দর্যই তত অধিক। বস্ত্রমাল্যবিভূষণ যত সহজে শরীর হইতে অপসারণ করা যাইতে পারে, সুরভিচন্দনের সুগন্ধ কিংবা কপোলবিন্যস্ত কুঙ্কুমরচিত পত্রলেখা, শুভ্রচন্দনের ললাটিকা মুছিয়া ফেলা তত সহজ নহে। সেইজন্য বিদগ্ধ রমণীগণের প্রসাধনের সামগ্রী কালাগুরুপত্রলেখা, অলকরচনা। কটককুণ্ডলের স্থূল প্রাকৃতহৃদয়হারী ঔজ্জ্বল্য তাঁহাদের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধকে পীড়া দেয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সেই একই তত্ত্ব। কাব্যালঙ্কারসমূহকেও ত্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যিনি সুকবি তিনি বিদগ্ধ নারীর ন্যায় অলঙ্কার নির্বাচনের সময় (যদিও

অলঙ্কারের সমস্ত ধর্ম নিঃশেষে সাহিত্যিক অলঙ্কারের স্কন্ধে চাপাইয়াছিলেন। কাব্যালঙ্কারসমূহ যে নারীদেহের প্রসাধনের সামগ্রী কটক, কুণ্ডল প্রভৃতি লৌকিক অলঙ্কার হইতে কোনও অংশে পৃথক্ হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কার কোনও আভাস তাঁহাদের গ্রন্থে নাই। তাঁহারা মনে করিতেন, শ্রবণ হইতে কুণ্ডল অপসারিত করিয়া যেমন তাহার পরিবর্তে কর্ণিকাসংযোগ করা যাইতে পারে, সেইরূপ কাব্যেও অনুপ্রাস, উপমা, রূপক, সমাসোক্তি প্রভৃতি শব্দার্থালঙ্কারসমূহ কবি তাঁহার ইচ্ছানুসারে গ্রহণ ও বর্জন করিতে পারেন। এই হানোপাদানবশত কাব্যসৌন্দর্যের এমন কিছু লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটিতে পারে, এইরূপ ধারণা তাঁহাদের ছিল না। অনেন্দবর্ধন কর্তৃক ধ্বনিবাদের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হইয়া গেল। আনন্দবর্ধন দেখাইলেন যে, পূর্বাচার্যকল্পিত অলঙ্কারের এই যথেচ্ছ সংযোগ-বিয়োগ সাহিত্যক্ষেত্রে কেন, লৌকিক প্রসাধনের ক্ষেত্রেও অসম্ভব। সাহিত্যের যাহা মূলীভূত তত্ত্ব, অর্থাৎ রসধ্বনি, অলঙ্কার তাহারই অনুযায়ী হইবে। আত্মার ঔচিত্য অনুযায়ী অলঙ্কারের যোজনা করিতে হইবে। অলঙ্কারের কোনও পৃথক্ সৌন্দর্য নাই। উপমা, যে উপমা বলিয়াই সর্বত্র সুন্দর হইবে, এমন কোনও নির্দিষ্ট বিধি নাই। অনুপ্রাস, যমক প্রভৃতি আপাতদৃষ্টিতে যতই শ্রুতিসুখকর হউক না কেন, সর্বত্রই তাহাদের এই মাধুর্য অখণ্ডিত থাকিবে, এইরূপ আশা করা যায় না। অভিনবগুপ্ত এই স্থলে একটি উদাহরণের দ্বারা ধ্বনিবাদগণের এই মতবাদ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, "শবশরীরে অলঙ্কারযোজনার দ্বারা কিছুমাত্র সৌন্দর্যসাধন করা যায় না, কেন না, সেখানে আত্মার অস্তিত্ব নাই। যতিশরীর অলঙ্কারমণ্ডিত হইলে দর্শকের হাস্যাবহ হইয়া উঠে, যেহেতু সেখানে আত্মার ঔচিত্য নাই।" অতএব কাব্যের আত্মস্বরূপ রসতত্ত্বের সদ্ভাব ও ঔচিত্য এই উভয়ের দ্বারা সাহিত্যে অলঙ্কার-যোজনা নিয়ন্ত্রিত হইবে। তবেই অলঙ্কার সৌন্দর্যের কারণরূপে বিবেচিত হইবে। নতুবা রসৌচিত্যের দিকে লক্ষ্য না করিয়া যে কবি

অলঙ্কার-বিন্যাস করিবেন, তিনি সাহিত্যিক সৌন্দর্যের মূল তত্ত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে পুষ্পভরণমণ্ডিতা শকুন্তলার যে মূর্তি মহারাজ দুষ্মন্তের দৃষ্টি বিমোহিত করিয়াছিল, সপ্তম অঙ্কে মহাকবি সেই শকুন্তলাকেই আবার নিরাভরণ মূর্তিতে দুষ্মন্তের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। প্রথম ক্ষেত্রে আভরণ-বিন্যাস সম্ভোগের উপকরণ ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নিরাভরণ পাণ্ডুতাই বিপ্রলম্ভ ব্যথাকে মূর্তিমতী করিয়া তুলিয়াছে। সমাহিত মহাদেবের তপোভঙ্গের জন্য প্রণয়মুগ্ধা পার্বতীর কত প্রসাধন, কত বিচিত্র আভরণ-বিন্যাস! কিন্তু উপেক্ষিতা, অবমানিতা পার্বতী যখন তপস্যায় প্রবৃত্ত, তখন তাঁহার অঙ্গ আভরণহীন, 'বার্ধকশোভি বল্কল' তাঁহার ভূষা! ধ্বনিবাদিগণের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহারা সৌন্দর্যের এই নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, এবং কবি ও সহৃদয়সমাজে ইহার প্রচার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। অলঙ্কারসমূহ—সাহিত্যিকই হউক, অথবা লৌকিকই হউক, যে সৌন্দর্যের উপাদান বলিয়া গৃহীত হয়, সে তাহাদের স্বতন্ত্র সৌন্দর্যের জন্য নহে, প্রকৃত রসের উৎকর্ষসাধনের তাহারা উপায় বলিয়া। রসই উপেয়, অলঙ্কার তাহার উপায় মাত্র। যদি অলঙ্কারের অপসারণের দ্বারা রসবোধের গভীরতা বৃদ্ধি পায়, তবে তাহাই কর্তব্য। নিরলঙ্কার স্বভাবোক্তিই সেখানে অলঙ্কৃত বক্রোক্তির সমস্থানীয়।

ধ্বনিবাদের প্রচারের ফলে অলঙ্কার সম্বন্ধে প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গীর অন্যান্য আরও পরিবর্তন সংঘটিত হইল। প্রাচীন মতবাদের সহিত যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা মনে করিতে পারেন যে, কাব্যদেহের সহিত অলঙ্কারের সম্বন্ধ অনেকটা নারীদেহের সহিত কটককুণ্ডলাদির সম্বন্ধের মতই। ইচ্ছানুযায়ী তাহার সংযোজন ও বিশ্লেষণ সম্ভবপর। কবি যেন পূর্বে মনে মনে অনলঙ্কৃত শুদ্ধ শব্দার্থযুগল কল্পনা করিয়া পরে ভাবিয়া চিন্তিয়া যমক, অনুপ্রাস প্রভৃতি শব্দালঙ্কার ও উপমা, রূপক প্রভৃতি অর্থালঙ্কারসমূহ তাঁহার রুচি অনুসারে কাব্যদেহে বিন্যস্ত করেন। সুতরাং অলঙ্কারযোজনার অব্যবহিত পূর্বে

প্রকৃতপক্ষে তিনি বুদ্ধিপূর্বক নির্বাচন করেন না) যমক-অনুপ্রাস প্রভৃতি একান্ত বাহ্য অলঙ্কারসমূহ সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিয়া চলেন। কাব্যদেহের সহিত তাহাদের সম্পর্ক অতিশয় শিথিল, নারীদেহের সহিত বস্ত্রমাল্যবিভূষণের ন্যায়। তাঁহারা যে সকল অলঙ্কার রচনা করেন, তাহা কাব্যশরীরের সহিত দৃঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট—ললাটিকার ন্যায়, পত্রবিশেষকের ন্যায়। প্রথমত অলঙ্কার বলিয়া তাহাদের চিনিতেই পারা যায় না, শব্দও অর্থের সহিত তাহারা যেন একাত্মতা প্রাপ্ত হইয়া যায়। মহাকবিগণের অলঙ্কাররচনার ইহাই বৈশিষ্ট্য।

দেখা গেল, মহাকবিগণের লেখনীতে কাব্যদেহ হইতে শব্দার্থালঙ্কাররাজিকে পৃথক করিয়া বিশ্লেষণ করা দুষ্কর। শব্দার্থরূপী কাব্যদেহের সহিত তাহারা সম্পূর্ণরূপে একতা প্রাপ্ত হয়। প্রশ্ন হইতে পারে : প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ যে অলঙ্কারসমূহকে কাব্যের আত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মতবাদের কি তবে কিছুমাত্র ভিত্তিই নাই ? অলঙ্কার কি কখনই কাব্যের আত্ম-পদবীতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না ? কাব্যদেহের সহিত সাযুজ্য লাভই কি তবে তাহাদের বিবর্তনের চরম নিষ্ঠা ? তাহারা কি কাব্যের গভীর অন্তঃপুরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্যতা লাভ করিতে একেবারেই অসমর্থ ? ইহার উত্তর দিয়াছেন আনন্দবর্ধনাচার্য ও অভিনবগুপ্ত। অভিনবগুপ্ত তাঁহার 'লোচন' ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন : "প্রাচীন আচার্যগণের অলঙ্কার বিচার শুধু বাচ্য অলঙ্কারসমূহকে কেন্দ্র করিয়া। যে সকল অলঙ্কার অতি স্ফুটভাবে, স্পষ্ট কথায় কবি তাঁহার কাব্যে প্রকাশ করিয়া থাকেন, ভামহ প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য সেই সকল অলঙ্কারেরই মুখ্যত বিচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ওই সকল বাচ্য অলঙ্কারই কাব্যের আত্মা। কিন্তু আমরা দেখিলাম, অলঙ্কার, যাহা স্পষ্টভাবে কবির লেখনীতে প্রকাশিত হয়, তাহারা কখনই কাব্যের আত্মতত্ত্বের সহিত ঐক্য লাভ করিতে পারে না। দেহৈক্যপ্রাপ্তিই বাচ্য অলঙ্কারসমূহের বিবর্তনের চরম নিষ্ঠা।

তাহার জন্যও আবার অনন্যসাধারণ প্রতিভার প্রয়োজন। মহাকবি প্রসাধন-নিপুণা বিদগ্ধ পুরন্ধ্রীর ন্যায় অলঙ্কারবিন্যাসে যতই কৌশলের পরিচয় দিন না কেন, তাঁহার লেখনী বাচ্য অলঙ্কারবর্গকে কখনই কাব্যশরীরের মর্যাদা উত্তীর্ণ করাইয়া অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশাধিকার দিতে পারে না। কিন্তু সেই অলঙ্কার যখন ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা ব্যাপারের দ্বারা বোধিত হয়, যখন সাক্ষাৎভাবে বাচ্য না হইয়া কাব্যের অনুরণনের (undertone) দ্বারা প্রতীত হয়, তখন তাহাই অনায়াসে কাব্যের আত্মার সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। ব্যঞ্জনা ব্যাপারের এমনই অলৌকিক মহিমা। স্পর্শমণির মত তাহা শরীরকে আত্মায় পরিণত করিয়া দিতে পারে, বহিরঙ্গকে অন্তরঙ্গতম করিয়া তুলিতে পারে, যাহা ছিল তুচ্ছ অলঙ্কার তাহাই ব্যঞ্জনার অনির্বচনীয় স্পর্শ লাভ করিয়া অলঙ্কার্য হইয়া উঠে।"—সুতরাং প্রাচীন আচার্য ও ধ্বনি-সম্প্রদায়ের নব্য সাহিত্যমীমাংসকগণের মধ্যে ভেদ শুধু দৃষ্টিভঙ্গীর বৈচিত্র্যে। অলঙ্কারের আত্মভাব ধ্বনিবাদীরাও মানিয়া লইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নন, কিন্তু তাহা ব্যঞ্জনা ব্যাপারের দ্বারা বোধিত হইতে হইবে। 'বাচ্য' অলঙ্কারের সে ঐশ্বর্য নাই। কিন্তু, যদিও ধ্বনিসম্প্রদায়ের নবীন আচার্যগণ বিশেষ ক্ষেত্রে অলঙ্কারেরও আত্মভাব মানিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহাদের মতে রসই কাব্যের মুখ্য আত্মা, কেন না, কাব্যের সমস্ত উপাদানের রসেই পর্যবসান। রসই কাব্যের অন্তরতম তত্ত্ব। ভরতাচার্য তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে রসকে বীজের সহিত তুলনা করিয়াছেন।[১] যেমন ক্ষুদ্র বীজ অঙ্কুর, কাণ্ড, শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট বৃহৎ বনস্পতিতে পরিণত হয়, ক্রমে যেমন তাহা মনোহর পুষ্পপল্লবে বিভূষিত হইয়া উঠে, এবং তাহার চরম পরিণতি যেমন বিচিত্র ফলসম্ভারে, সেইরূপ কবির অন্তর্গূঢ় রসবীজ আপন প্রাণশক্তির উল্লাসবশে শব্দ, অর্থ, অলঙ্কাররূপে আপনাকে অঙ্কুরিত, কুসুমিত, মঞ্জরিত করিয়া তুলে, সর্বশেষে পরিণত হয়

১. "যথা বীজাদ্ ভবেদ্ বৃক্ষো বৃক্ষাৎ পুষ্পং ফলং তথা।
তথা মূলং রসাঃ সর্বে তেভ্যো ভাবা ব্যবস্থিতাঃ"—নাট্যশাস্ত্র, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

সহৃদয়ের রসচর্বণায়। এই রসাস্বাদই কাব্যবৃক্ষের অমৃতময় ফল। সুতরাং রসবীজ হইতে কাব্যের উৎপত্তি, রসাস্বাদেই ইহার পরিসমাপ্তি। বৃহৎ শাখাপল্লববিশোভিত বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র অখণ্ড বীজেরই প্রাণশক্তির বিবর্তন মাত্র, সেইরূপ শব্দ অর্থ অলঙ্কার—কাব্যের যত কিছু উপাদান সমস্তই কবিচিত্তে নির্বিভাগ, অখণ্ড রসানুভূতির বিবর্তন মাত্র, কবির আন্তর পরিস্পন্দেরই বাহ্য আকার মাত্র। কবির কাব্যসৃষ্টির ইতিহাস শুধু তাঁহার নিবিড় রসানুভূতিরই আবেগময় বিবর্তনের ইতিহাস।

—

শব্দার্থসূচী

ভরত	নাট্যশাস্ত্রের রচয়িতা। আনুমানিক খৃঃ ১ম শতক।
ভামহ	'কাব্যালঙ্কার' গ্রন্থের প্রণেতা। আঃ খৃঃ ৭ম শতক।
দণ্ডী	'কাব্যাদর্শ' গ্রন্থের রচয়িতা। আঃ খৃঃ ৭ম শতক।
অভিনবগুপ্ত	দার্শনিক ও আলঙ্কারিক। খৃঃ ১০ম শতক। 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থের 'লোচন' টীকা এবং ভরতের নাট্যশাস্ত্রের 'অভিনবভারতী' নামক ভাষ্য তাঁহার দুইটি প্রধান আলঙ্কারিক নিবন্ধ।
মম্মটাচার্য	'কাব্যপ্রকাশ' গ্রন্থের প্রণেতা। খৃঃ ১১শ শতক।
উদ্ভট	কাশ্মীরীয় আলঙ্কারিক। আবির্ভাব-কাল খৃঃ ৮ম শতক। ইঁহার 'কাব্যালঙ্কারসারসংগ্রহ' একখানি প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক নিবন্ধ। 'ভামহ-বিবরণ' নামে ভামহের 'কাব্যালঙ্কার' গ্রন্থের উপর ইঁহার একখানি প্রসিদ্ধ টীকা ছিল। সেখানি অধুনালুপ্ত। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের অন্যতম

	ভাষ্যকার বলিয়াও ইহার প্রসিদ্ধি আছে।
আন্বীক্ষিকী	ন্যায়শাস্ত্র বা Logic।
আনন্দবর্ধন	কাশ্মীরীয় আলঙ্কারিক ও দার্শনিক। খৃঃ ৯ম শতাব্দী। 'ধ্বন্যালোক'-রচয়িতা।
পরীবাহ	পয়ঃপ্রণালী।
উপোদ্‌ঘাত	অবতরণিকা, ভূমিকা।
লোকায়তিক	চার্বাক-সম্প্রদায়ের দার্শনিক (Materialists)।
ভূতচৈতন্যবাদী	পঞ্চভূতের মিশ্রণ হইতেই চৈতন্যরূপ (consciousness) একটি বিশিষ্ট ধর্মের উদয় হয়, এই মত যাঁহারা স্বীকার করেন। যেমন, তাম্বূল, খদির, চূর্ণক প্রভৃতির মিশ্রণে রক্তিমা উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ।
অভিধাশক্তি	function of denotation।
ব্যঙ্গ্য	বাচ্য অর্থ-ব্যতিরিক্ত প্রকরণ, বক্তৃ-বোদ্ধব্য প্রভৃতির বৈশিষ্ট্যবশতঃ প্রতীয়মান অর্থান্তর। ইংরাজীতে যাহাকে বলা যাইতে পারে suggested sense।
ব্যঞ্জনা	ব্যঙ্গ্যার্থপ্রতীতির উপযোগী শব্দ ও অর্থের ব্যাপারবিশেষ।

শারদাতনয়	'ভাবপ্রকাশ'-গ্রন্থের রচয়িতা। খৃঃ ১২শ-১৩শ শতাব্দী।
মহর্ষি ব্যাস	পাতঞ্জল যোগসূত্রের ভাষ্যকার।
উদয়ব্যয়শালী	আবির্ভাব-তিরোভাবশালী।
অস্তময়	বিলয়, তিরোভাব।
হেমচন্দ্র	জৈন আচার্য। 'কাব্যানুশাসন'-নামক আলঙ্কারিক নিবন্ধের রচয়িতা। খৃঃ ১২শ শতাব্দী।
পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ	বিখ্যাত বৈয়াকরণ, কবি ও আলঙ্কারিক। 'রসগঙ্গাধর' গ্রন্থের রচয়িতা। বাদশাহ্ শাহ্জাহানের সভাকবি ছিলেন। খৃঃ ১৭শ শতক।
সঙ্গীতরত্নাকর	সংস্কৃতে সঙ্গীতবিদ্যা-বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ। রচয়িতা শার্ঙ্গদেব। খৃঃ ১৩শ শতক।
ভট্টলোল্লক	আলঙ্কারিক। নাট্যশাস্ত্রের ভাষ্য-লেখকরূপে প্রসিদ্ধ। অভিনবগুপ্তের পূর্ববর্তী।
কুশীলব	অভিনেতৃনট।
নাট্যদর্পণকার	রামচন্দ্র ও গুণচন্দ্র। ইঁহারা জৈন-সম্প্রদায়ের লেখক। খৃঃ ১২শ শতক।
আচার্য ভট্টতৌত	আচার্য অভিনবগুপ্তের অন্যতম

সাহিত্যগুরু। ইহার 'কাব্যকৌতুক'-নামক আলঙ্কারিক নিবন্ধ অধুনালুপ্ত।

ভট্টশঙ্কক — অভিনবগুপ্তের পূর্বগামী আচার্য, নাট্যশাস্ত্রের অন্যতম ব্যাখ্যাতারূপে প্রসিদ্ধ।

সংশয়াত্মক বিরুদ্ধো-ভয়কোটিক জ্ঞান — সংস্কৃত ন্যায়শাস্ত্রে সংশয় (doubt)কে 'বিরুদ্ধোভয়কোটিক জ্ঞান বলা হয়। কেননা, সংশয়ের স্থলে চিত্তবৃত্তি দুইটি বিরুদ্ধ (contrary or contradictory) কোটি (পক্ষ, extreme or alternative)-এর মধ্যে দোলায়িত হইতে থাকে। যেমন, 'এটি কি স্থাণু, বা পুরুষ?'

পরামর্শজ্ঞান — হেতু বা middle term-এর পক্ষ বা minor term-এ অবস্থিতির জ্ঞান।

অর্থক্রিয়া — প্রয়োজনসিদ্ধি। বৌদ্ধদর্শনের একটি প্রসিদ্ধ পারিভাষিক শব্দ।

সংবাদিভ্রম, বিসংবাদিভ্রম — যে ভ্রমের স্থলে ঈপ্সিত বস্তু লাভ ঘটিয়া থাকে, তাহাকে সংবাদিভ্রম কহে। তাহা না হইলে, উহা বিসংবাদি-ভ্রম রূপে পরিচিত। সংবাদ = correspondence।

ধর্মকীর্তি — খ্যাতনামা বৌদ্ধদার্শনিক। 'প্রমাণ-বার্তিক', 'ন্যায়বিন্দু' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দার্শনিক নিবন্ধের রচয়িতা।

অনুমিতিপ্রমা — valid inferential knowledge।

রুয্যক — বিখ্যাত কাশ্মীরীয় আলঙ্কারিক ও টীকাকার। খৃঃ ১২শ শতাব্দী।

ভট্টনায়ক — অভিনবগুপ্তের পূর্বগামী আচার্য ও ধ্বনিবাদের প্রধান সমালোচক। ইঁহার 'হৃদয়দর্পণ' নামে অলঙ্কারনিবন্ধ বর্তমানে অপ্রাপ্য। ইনি নাট্যশাস্ত্রের অন্যতম ব্যাখ্যাতারূপেও প্রসিদ্ধ।

ভাবনা — function of universalisation, বা সাধারণীকৃতি।

ভোগীকৃতি — relish বা রসাস্বাদনব্যাপার।

গুণ — শব্দ ও অর্থের বিশিষ্ট বিন্যাসজনিত কাব্যের উৎকর্ষহেতু কতকগুলি ধর্ম।

আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য, সাত্ত্বিক — যথাক্রমে, অঙ্গবিক্ষেপ, বাক্যপ্রয়োগ, বেশভূষা এবং মনোবিক্রিয়ার সাহায্যে প্রকটিত চতুর্বিধ অনুকৃতি বা অভিনয়।

ভারতী, সাত্বতী, কৈশিকী, আরভটী — চারিটি বিশিষ্ট নাট্যবৃত্তি।

শৈবপ্রত্যভিজ্ঞাবাদিগণ — অনুভূত (perceived) ও স্মৃত

	(recollected) বস্তুর মধ্যে ঐক্য বা অভেদের উপলব্ধিকে দর্শনশাস্ত্রে প্রত্যভিজ্ঞা (recognition) কহে। যেমন, 'এই সেই দেবদত্ত।' সেইরূপ জীবাত্মা এবং পরমশিব বা পরমাত্মা, এই উভয়ের মধ্যে যতক্ষণ না 'আমিই সেই' এইরূপ ঐক্যানুভূতি বা প্রত্যভিজ্ঞা ঘটে ততক্ষণ মুক্তি হইতে পারে না। এই মত শৈবপ্রত্যভিজ্ঞা-বাদরূপে প্রখ্যাত।
শবলিত	চিত্রিত বা variegated।
সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত	সকল দার্শনিক প্রস্থানের সাধারণ সিদ্ধান্ত। তন্ত্র=শাস্ত্র।
কুন্তকাচার্য	বিখ্যাত কাশ্মীরীয় আলঙ্কারিক। 'বক্রোক্তিজীবিত'-রচয়িতা। খৃঃ ১০ম শতক।
আচার্য উৎপলদেব	কাশ্মীরীয় প্রত্যভিজ্ঞাপ্রস্থানের পরমাচার্য ও অভিনবগুপ্তাচার্যের পরমগুরু।
মল	প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনে বেদান্তসম্মত অবিদ্যা (nescience)'র প্রতিশব্দ।
মাণিক্যচন্দ্রসূরি	জৈন আলঙ্কারিক ও মম্মটের কাব্যপ্রকাশের অন্যতম টীকাকার। খৃঃ ১২শ শতক।

লক্ষণা	কোনও শব্দের বাচ্যার্থ বাধিত হইলে যে ব্যাপারের দ্বারা ঐ বাচ্যার্থের সহিত সাদৃশ্য, সামীপ্য, বিরোধ প্রভৃতি সম্বন্ধবিশিষ্ট কোনও অর্থান্তরের বোধ হয়, তাহাকে লক্ষণাব্যাপার কহে, এবং সেই ব্যাপারের দ্বারা বোধিত অর্থকে লক্ষ্যার্থ কহে।
যোগাচারসম্প্রদায়	বৌদ্ধদর্শনের অন্যতম সম্প্রদায়-বিশেষ। এই সম্প্রদায়ের মতে জ্ঞান-ব্যতিরিক্ত বাহ্য কোনও জ্ঞেয় বস্তুর সত্তা নাই। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে এই মতবাদ Subjective Idealism বলিয়া পরিচিত।
ধনিক	ধনঞ্জয়কৃত 'দশরূপক'-নামক নাট্য-বিষয়ক গ্রন্থের বৃত্তিকার। ইঁহার রচিত বৃত্তির নাম 'অবলোক'। খৃঃ ১০ম শতাব্দী।
সৌভিক	নট।
সাক্ষিভাস্য ও বৃত্তিভাস্য	অন্তঃকরণের বিষয়াকারে পরিণামকে বৃত্তি কহে। যেখানে আত্মা অন্তঃকরণবৃত্তির সাহায্যে বিষয়কে প্রকাশ করিয়া থাকে, সেখানে বিষয়টি 'বৃত্তিভাস্য'; কিন্তু যেখানে

	বৃত্তির কোনও প্রয়োজন হয় না, সেখানে উহা 'সাক্ষিভাস্য'।
অসত্তাপাদক, অভানাপাদক ও অনানন্দাপাদক অজ্ঞান	যথাক্রমে আত্মার সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দ অংশের আবরক অজ্ঞান।
আবরণভঙ্গ	আত্মার স্বরূপ-আবরক ত্রিবিধ অজ্ঞানের বিলয়।

—

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
বিশ্বপরিচয়	১'৮০
ইতিহাস	২'৫০
শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
প্রাণতত্ত্ব	২'৩০
শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী	
বাংলা সাহিত্যের কথা	১'৫০
শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য	
ব্যাধির পরাজয়	১'৫০
শ্রীনির্মলকুমার বসু	
হিন্দুসমাজের গড়ন	২'৫০
উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য	
ভারতদর্শনসার	৩'৩০
শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	
বাংলা উপন্যাস	২'০০
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	
ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা	২'৩০
সুরেন ঠাকুর	
বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ	২'৩০
শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু	
হিউএনচাঙ	২'৫০, বোর্ড ৩'০০
যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি	
পূজাপার্বণ	৩'০০, বোর্ড ৪'০০
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল	
বাংলার নব্যসংস্কৃতি	১'৪০